চৈতন্য সরণী

বারিদবরণ ঘোষ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৫৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রাকর
নিরুপম চৌধুরী
চৌধুরী কনসার্ণ
৫৭/২ই কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত ।।

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ এম, এস্‌-সি,
কাকাবাবু শ্রীচরণেষু

নিবেদন

শচীনন্দন কৃষ্ণচৈতন্যের জন্মের পাঁচশো বছর পূর্ণ হল। তাঁকে স্মরণের এক শুভ মুহূর্ত আমাদের সামনে উপস্থিত। চৈতন্যের জীবন আর পাঁচজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। কিসে স্বতন্ত্র—তাঁর জীবনকথাতেই তা বোঝা যায়।

চৈতন্য তাঁর জীবৎকালেই ঈশ্বররূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁব মূর্তি পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল আরাধনার জন্যে। সে সময়েই এবং তাঁর তিরোধানের অল্পকালের মধ্যেই তাঁর জীবন বৈষ্ণবতত্ত্বের আধার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আমি সেই তত্ত্বের কথা বলতে চাইনি। কারণ তত্ত্ব সৃষ্টি করেন পরবর্তীকালের মানুষ। আজ সাড়ে চারশো বছর ধরে সেই তত্ত্ব নিয়ে তাঁর ভক্তরা চিন্তা করছেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনের আগ্রহী পাঠকের উপর কোনো তত্ত্ব আমরা চাপিয়ে দিতে চাইনি। সেজন্য মানুষ চৈতন্যের একটা ধারাবাহিক সহজ চিত্র যথাসম্ভব সহজ ভাষায় আমরা আঁকতে চেয়েছি। এথেকে কিছু পাঠক যদি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সে তাঁদের মনোগত ব্যাপার।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য মঙ্গল (চৈতন্য ভাগবত নামেই সুপরিচিত) সর্বাধিক জনপ্রিয় এর সহজ পরিবেষণ গুণের কারণে। সেই সাধারণ পাঠক, বিশেষত কিশোর-দের কথা ভেবে বইটি সংযত আকারে এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখবার চেষ্টা করেছি।

এই প্রয়াসে স্বভাবতই পূর্বসূরীদের সকলের কাছেই আমার ঋণ। তবে বিশেষ করে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত আমার প্রধান আকরগ্রন্থ। এদেরকে ভিত্তি করেই এই বই লিখতে প্রয়াস পেয়েছি। প্রফুল্লকুমার সরকারের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' বইটি সর্বক্ষণ হাতের কাছে ছিল। এ ছাড়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতির রচনাবলী থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। দুটি গ্রন্থাগার—শ্রীগোপাল

ব্যানার্জি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বড়া বয়েজ ক্লাব—আমাকে উপকরণ সরবরাহ করেছে।

গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়েছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষচন্দ্র ঘোষ (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য), কন্যাদ্বয় কল্যাণীয়া সুত-নুকা ও সুবর্ণা। বইটির নামকরণ করেছেন আমার রচনাসমূহের কঠোর সমালোচক কবি শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ।

শ্রীসমীরনাথ আমার সদ্যোলব্ধ বন্ধু। এই বই প্রকাশ তাঁর বন্ধুকৃত্য। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রীতির। তাঁকে প্রীতি নিবেদন করি।

এই বইয়ের পাঠকের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

রোজভিলা, বর্ধমান। বারিদবরণ ঘোষ

এই লেখকের রচিত ও সম্পাদিত অন্য বই

রচিত

সাহিত্যসাধক শিবনাথ শাস্ত্রী
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সাধনা
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সরলাবালা সরকার
বিয়ের পদ্য
রামগোপাল ঘোষ : সময় জীবন সাধনা (যন্ত্রস্থ)
মোগল সম্রাটের অন্দরমহল (যন্ত্রস্থ)
কুরুক্ষেত্রের শেষ দশবীর (যন্ত্রস্থ)
পুষ্প পুঁথি (ঐ)
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (ঐ)

সম্পাদিত ও অন্যান্য

দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড
শিবনাথ রচনা সংগ্রহ ১ ও ২ খণ্ড
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প
সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প
ছোটদের লেখা : বিপিনচন্দ্র পাল
উপকথা : শিবনাথ শাস্ত্রী
কাঞ্চনমালা/বেণের মেয়ে : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
পল্লী বৈচিত্র্য : দীনেন্দ্রকুমার রায়
সম্বন্ধ নির্ণয় : লালমোহন বিদ্যানিধি (যন্ত্রস্থ)
বৌদ্ধধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যন্ত্রস্থ)

পুরন্দর মিশ্রের বাড়িতে হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। কিন্তু কান পেতে কেউ সে শব্দ আলাদা করে চিনতে পারলে না। পথে পথে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তখন হাজারো শাঁখের আওয়াজ। হরিধ্বনি যেন আকাশকে ছুঁতে চাইছে আর সব কিছুকে মাতিয়ে তুলেছে খোল-করতালের মধুর মধুর ধ্বনি।

কেন আজ এতো আনন্দ নবদ্বীপের পথে পথে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে? আজ যে পূর্ণিমা তিথি, তাতেই কী? না, না, আজকের পূর্ণিমা যে আর পাঁচটা পূর্ণিমা থেকে আলাদা। আজ যে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে।

আজ যেন কতো তারিখ? বাংলা নিয়মে ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাস। ইংরেজি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি। কোথায় এতো হরিধ্বনি? নবদ্বীপে। এখনকার নবদ্বীপ নয় যে হাওড়া বা ব্যাণ্ডেল বা কাটোয়া থেকে ট্রেনে চ'ড়ে অথবা কোনো বাসে উঠে বলবো নবদ্বীপ চললুম। সে নবদ্বীপ তখন শুধু একটা বৈষ্ণবতীর্থ, একটা শহরমাত্র নয়। সে নবদ্বীপ এক গৌরবময় স্থান। কি বিদ্যাচর্চায়, কি ধনদৌলত সব তাতেই নবদ্বীপ একটা নামকরা জায়গা—শুধু বঙ্গদেশের নয়, সমগ্র ভূ-ভারতেরও বুঝি। 'চৈতন্য ভাগবতে' বৃন্দাবন দাস লিখে গেছেন—

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

সকলেই মহাপণ্ডিত, এমনকি যারা বালক তারাও বিদ্যাবুদ্ধিতে এমন পণ্ডিত ছিলো যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পেতো না। যত অধ্যাপক, তত পড়ুয়া। এই নবদ্বীপেই গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত—যার নাম বাসুদেব সার্বভৌম। এখানে তিনি জন্মেছিলেন।

সে সময়ে পড়াশুনোর ব্যাপারে পূর্বভারতের মধ্যে মিথিলার খুব নাম ডাক। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি পড়ার জন্যে দেশের চারদিক থেকে পড়ুয়ারা মিথিলার টোলে এসে ভিড় করতো। বাসুদেব সার্বভৌমও সেখানে পড়তে গেলেন। সেখানে পড়াশুনো করার একটা সর্ত্ত ছিল। পড়াশুনো যা করবে করো বাপু, মুখস্থও করো প্রাণপণে। কিন্তু একটা পাতড়াও কেউ লিখে নিয়ে যেতে পারবে না। বাসুদেব ছিলেন অসাধারণ মেধাবীছাত্র। যা শিখতেন একেবারে মুখস্থ হয়ে যেতো এই শ্রুতিধর পণ্ডিতটির। মিথিলায় তখন অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের ভারী নামডাক। বাসুদেব সার্বভৌম দেশে ফিরে শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে পাঠিয়ে দিলেন মিথিলায়। রঘুনাথ গিয়ে পক্ষধর মিশ্রের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়লেন। এমন পড়লেন যে গুরু পর্যন্ত হার মেনে গেলেন তাঁর বিদ্যার গৌরবের কাছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই পংক্তি দুটো আমাদেব নিশ্চয়ই মনে আছে:

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি,
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।

শুধু কি বাসুদেব আর রঘুনাথ? স্মৃতিশাস্ত্রের অসামান্য পণ্ডিত রঘুনন্দন—যিনি 'স্মার্ত' রঘুনন্দন নামেই সুপরিচিত, সেই তিনি; তন্ত্রশাস্ত্রের সুখ্যাত সংগ্রহকর্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—এঁরাও নবদ্বীপের তৎকালীন গৌরবের স্তম্ভ-স্বরূপ।

তাছাড়া নবদ্বীপের সঙ্গে নদীপথে পূর্বভারতের নানা জায়গায় সংযোগ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। নবদ্বীপ ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের উপ-রাজধানী—যাকে বলে কাছারি-বাড়ি। এমন একটি ধনসম্পদ ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ জায়গা ছিল নবদ্বীপ। কতো জ্ঞানী-গুণী যে বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে বসবাস করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে তার হিসেব রাখেনি কেউ।

কিন্তু সকলেই যে একই রকমের ধর্ম আচরণ করছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। সিংহাসনে তখন মুসলমান রাজা—অনেকেই সেই ধর্মগ্রহণ করেছেন। কেউ বা শক্তির উপাসক—তিনি শক্তির উপাসনা

করেন, কেউ বা বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসক। নানান মতের লোকের বাস। কেউ বা শুষ্ক পাণ্ডিত্য নিয়ে গৌরব করেন, কেউ বলেন এসব দিয়ে কি হবে—কৃষ্ণভক্তি কর।

বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন বাংলাভাষায় প্রথম চৈতন্য-জীবনী 'চৈতন্য ভাগবত'। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। শাক্ত-সম্প্রদায়ের কাজকর্ম তাঁর ভাল লাগেনি স্বভাবতই। তাই তাঁর নিজের মতো করে সেসময়ের নবদ্বীপের ধর্মকর্মের একটা ছবি এঁকেছেন এইভাবে :

ধর্মকর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥

তাঁরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে অযথা 'ধন নষ্ট' করেন। কেউ 'মদ্যমাংস দিয়ে যক্ষপূজা করে'। কোথাও কৃষ্ণকথা নেই। তাই পরম বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্যের মনে বড় দুঃখ। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যান আর উপর দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন—'কই প্রভু কৃষ্ণ, এসো, জীব উদ্ধার করো'। এমনি দুঃখ শ্রীবাস, চন্দ্রশেখরের মনেও। এঁরা একত্রিত হয়ে মাঝে মাঝে কৃষ্ণকথা গান আর কীর্তন করেন। এমনি করেই সে-কালের নবদ্বীপের দিনগুলো কাটছিল।

২

এমনি এক নবদ্বীপে বাস করতে এসেছিলেন পুরন্দর মিশ্র। ও হো, বলতে ভুলে গেছি পুরন্দর মিশ্র যিনি, তাঁর একটা পোষাকী নামও ছিল জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এঁর আসল বাড়ি ছিল শ্রীহট্টে। ইংরেজিতে যাকে বলে সিলেট। জগন্নাথের বাবার নাম উপেন্দ্র মিশ্র—জগন্নাথ তাঁর তৃতীয় সন্তান। হঠাৎ শ্রীহট্ট ছেড়ে জগন্নাথ নবদ্বীপে এলেন কেন ? সে অনেক কথা। কেউ বলেন শ্রীহট্টে হিন্দুদের অনেককে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছিল।

কেউ বলেন অর্থনৈতিক কারণে অনেকে সিলেট ছাড়েন। আর বিদ্যা-চর্চার জন্যে তখন তো অনেকেই নবদ্বীপে আসতেন। যাই হোক, হয়তো লেখাপড়া শেখার জন্যেই জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। মজার ব্যাপার সে সময়ে শ্রীহট্টের অনেক মানুষই নবদ্বীপে এসে বাস করতে শুরু করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যের সহপাঠী মুরারি গুপ্ত, তপন মিশ্র, শ্রীবাস, চৈতন্যের মেসোমশাই চন্দ্রশেখর এঁরা সবাই শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন।

আরও একজন নবদ্বীপে এসেছিলেন—নীলাম্বর চক্রবর্তী। জগন্নাথ আর নীলাম্বর একই গাঁয়ের লোক। নবদ্বীপে আসার পর নীলাম্বর জগন্নাথের শ্বশুর হলেন তাঁর মেয়ে শচীর সঙ্গে জগন্নাথের বিয়ে দিয়ে। কেউ কেউ যে বলেন (যেমন জয়ানন্দ) জগন্নাথরা উড়িষ্যার যাজপুরের লোক ছিলেন, তা ঠিক নয়।

জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর খুব একটা সামান্য লোক ছিলেন না। নীলাম্বর বেশ প্রভাবশালী মানুষই ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসক 'কাজী' তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। তিনি বেশ ভালো জ্যোতিষীও ছিলেন। মেয়ের ছেলে হলে তিনি তার কোষ্ঠী-ঠিকুজী তৈরি করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই ছেলে (অর্থাৎ চৈতন্য) খুব বিখ্যাত মহাপুরুষ হবে।

শচীদেবী খুব ভক্তিপরায়ণা নারী ছিলেন। শ্রীহট্টের লাউড় অঞ্চল থেকে এসে এক বৃদ্ধ রাজ-গুরু পণ্ডিত তাঁর ছেলেসহ নবদ্বীপে বাস করছিলেন অনেকদিন আগে থেকেই। তাঁর এই পুত্রটিই হলেন সুবিখ্যাত অদ্বৈত আচার্য। জগন্নাথ তাঁকে অভিভাবকের মতো সম্মান দিতেন। শচীদেবী তাঁর কাছেই মন্ত্রদীক্ষা নেন। তাঁর বড়ো ছেলে বিশ্বরূপের তিনি শিক্ষক ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে অদ্বৈতের স্নেহ-ভক্তি-শ্রদ্ধার মিশ্রণে এক অভূতপূর্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শচীদেবীর সঙ্গে বিয়ের পর নীলাম্বরের অনুরোধেই জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপেই বাড়ি তৈরি করে বাস করছিলেন। ধনী মানুষ ছিলেন না। তবে মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের অভাবও ছিল না। যে কোনো

কারণেই হোক চৈতন্যের জন্মের পর থেকে তাঁদের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়।

কিন্তু চৈতন্যের জন্মের আগে পর্যন্ত তাঁরা বড়ো দুঃখী ছিলেন। পরেও। দুঃখও কম হয়নি—দুটি বেঁচে থাকা ছেলেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ-ত্যাগ করেছিলেন।

জগন্নাথ-শচীর আট আটটি সন্তান জন্মাবার পর একে একে সবাই মারা যায়। বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তাঁদের প্রতিটি সন্তানের মৃত্যুর পর। শেষে নবম সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাঁরা নাম রাখলেন বিশ্বরূপ। দেখতে ভারি সুন্দর। অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি। পড়াশুনোয় ভারি মন। ধীর, স্থির, গম্ভীর। মান্যজনকে মান্য করেন। ছোট ভাই নিমাই জন্মালেন যখন তখন তাঁর বয়স প্রায় বারো। ছোট ভাইকে ভালবাসেন খুব। গঙ্গাস্নান করে এসে কখনো হরিকথা আলোচনা করেন অদ্বৈতের হরিসভায়। অদ্বৈতের কাছেই থাকতে ভালবাসেন খুব। বাড়িতে আসতে চান না একেবারে। যদি বা আসেন, ঠাকুর ঘরেই কাটান সর্বক্ষণ। দেখে শুনে মায়ের মনে উদ্বেগ। বাবারও ভাল লাগে না বড় ছেলের এমন উদাস উদাস ভাব। মা-বাপে পরামর্শ করে ঠিক করলেন ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে হবে সংসারে। বিশ্বরূপ মনে খুব কষ্ট পেলেন এসব কথা শুনে। মনে মনে ভাবলেন—আর না, এবার সংসার ছেড়ে বনে চলে যাবো। শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়েই চলে গেলেন। তাঁর নাম হলো শ্রীশঙ্করারণ্য। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ অন্তহীন পথে যাত্রা করলেন।

৩

বিশ্বরূপ চলে গেলেন। ঘরে একমাত্র সান্ত্বনা নিমাই। জগন্নাথ শচীর মনে পড়ে যায় প্রায়ই সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার কথা। সেই চাঁদে গ্রহণ লাগার কথা। সেই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে হরিধ্বনি, মৃদঙ্গধ্বনির উদ্দামতা। সে তো আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেকার কথা। ৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন। সন্ধ্যাবেলা। চাঁদে তখন গ্রহণ লেগেছে। আসলে

আসলে মাটিতে যে তখন চাঁদের উদয় হয়েছে। মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়! কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন।

'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥

শাঁখের আওয়াজ শুনে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। এসে কি দেখলেন তাঁরা?

দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে
একত্র হৈছে কোটি চান্দরে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
(চৈতন্য ভাগবত)

শচী-জগন্নাথ ছেলের মুখ দেখে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আত্মীয় স্বজনেরাও দেখতে দেখতে এসে পড়লেন। এলেন শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী। এসেই তিনি যেন সব নানা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখলেন। জ্যোতিষ-গণনা করে বললেন—এ তো দেখছি রাজার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। এতো বুদ্ধিতে বৃহস্পতির চেয়েও বিদ্বান হবে। আদর করে নাতির নাম রাখলেন—বিশ্বম্ভর।

উপস্থিত এক ব্রাহ্মণ বললেন—এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। লোকেরা একে বলবেন নবদ্বীপচন্দ্র—নদীয়ার চাঁদ।

খবর পেয়ে দোলায় চড়ে এলেন স্বয়ং আচার্য-পত্নী সীতা দেবী। সঙ্গে নিয়ে এলেন নানান উপহার। আনলেন সোনার হার, রূপোর টাকার হার, সোনার তাড়ু, রূপোর মলবাঁক, সোনার আংটি, কোমরের রেশমী ঘুনসি, নানারঙা রেশমী শাড়ি, আরও কত কি? শিশুকে দেখে 'চিরজীবী হও' বলে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

জগন্নাথ খুশিতে ডগোমগো। যা ছিল, দরিদ্রদের দান করে আজ-

তাঁর বড়ো আনন্দ। তাঁর আনন্দই বুঝি সংকীর্তনের রূপ নিয়ে সমগ্র নবদ্বীপ তুলেছে মাতিয়ে।

নীলাম্বর 'বিশ্বম্ভর' নাম দিয়েছিলেন বড় ভাই বিশ্বরূপের সঙ্গে নাম মিলিয়ে। তা দিলে কি হবে, ঐ নামে কেউ ডাকেনই না। অমন সোনার বরণ গৌর অঙ্গ যার তার তো একটা সহজ নামই আছে। গৌর। গৌরাঙ্গ। আর তা থেকেই সবাই ডাকেন গোরা।

আর ডাকেন পাড়া প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা একটা ডাক নামে—নিমাই। আট ছেলে ম'রে বিশ্বরূপ। আবার বিশ্বরূপের বারো বছর পরে এই ছেলে। ষাট, ষাটের বালাই। যমের কুনজর যেন এই ছেলের উপর না পড়ে। এ তেতো ছেলে, নিমের মতো তেতো। যমের রুচিই হবে না এ ছেলের জন্যে। তাই আদর করে ডাকেন সবাই 'নিমাই'।

ইহান অনেক জ্যৈষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম যে নিমাই॥

সীতাদেবীর পছন্দ এই 'নিমাই' নাম। কে জানতো এই 'নিমে'ই এতো মাধুর্য!

৪

'দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু'—লিখেছিলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কন-মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ঐ 'কালকেতু'র মতোই, ঐ চন্দ্রকলার মতোই গৌরচন্দ্র দিনে দিনে বাড়তে লাগলেন আর দিনে দিনে বাড়তে থাকল তার দুষ্টুমি। ঘরের সব জিনিস এলোমেলো। হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ান আর ঘুনসিতে ঘুঙুর বাজে ঘুন ঘুন। একদিন একটা সাপকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। আবার হরিধ্বনি শুনে নাচও করেন।

কি সুন্দরই না দেখতে। যিনি দেখেন তিনিই দুহাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে আদর করেন। মাথায় দোদুল দোদুল চুল, চোখ দুটি টানা পদ্মের পাপড়ি, ঠোঁট দুটি যেন পাকা তেলাকচু। চাঁপার মতো আঙুল। আহা-হা কি মাধুরীই যেন সারা অঙ্গে মাখানো।

আসতে আসতে হাঁটতে শিখেছেন গোরা। এর ওর বাড়িতে

পালিয়ে পালিয়ে যান এখন। চেয়ে খান, আবার কখনো কখনো কেড়ে নিয়েও খান। রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারেন না অনেকে। এতো সুন্দর, এতো মিষ্টি একটা ছেলের উপর কি কেউ রাগ করতে পারে! কেউ যদি তবুও চেপে ধরেন—অমনি তার পায়ে ধরে—'এবারের মতো ছেড়ে দাও, আর আমি একাজ করবো না গো! সত্যি বলছি গো' বলে মিনতি করে পরিত্রাণ পান।

একদিন এক ব্রাহ্মণ এলেন জগন্নাথের বাড়ি। নিজেই রেঁধে খাবেন তিনি। যতবারই রান্না করেন, ততবারই এসে পাতের ভাত তুলে খপ করে মুখে তুলে নিয়ে তাঁর খাবার নষ্ট করেন নিমাই। সবাই জিগ্যেস করলে বলেন, খাবো না কেন ঐ বামুনের পাতের ভাত। ও-ই তো খাবার আগে আমাকে ডাকে। আমিই তো ভগবান, আমাকে ও ডাকল কেন, তাই গিয়ে খেয়ে নিলাম। শুনে সবাই অবাক্।

৫

দেখতে দেখতে নিমাই বড়ো হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে—পড়াশুনো করতেই হবে। পাঁজি বের করে দেখা হল হাতে-খড়ির শুভ-দিন। সমবয়সী কয়েকটি বন্ধুও এল হাতে-খড়ি দেখতে। কর্ণবেধ করা হল। বড় বড় করে লেখা হল অ-আ ক-খ অক্ষর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিমাই দেখামাত্রই সব অক্ষর নকল করতে পারলেন। সবাই অবাক। দু'তিন দিনেই 'ফলা' পর্যন্ত শিখে নিলেন শিশু নিমাই। পড়াশুনোয় খুব মন। দিনরাত পড়ে আছেন পাত্‌তাড়ি নিয়ে।

কিন্তু দুষ্টুমি তাঁর মজ্জাগত। মুখে বায়না লেগেই আছে। আকাশে পাখী উড়ে যেতেই বায়না ধরেন—আমাকে ঐ পাখী এনে দাও। দিতে না পারলেই ধুলোয় গড়াগড়ি। এক্ষুণি বলেন আকাশের চাঁদ চাই, তক্ষুণি বলেন আকাশ থেকে তারা পেড়ে এনে দাও। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদেন আর কেঁদে পাড়া মাত করেন। কোলে নিয়ে আদর করলেও স্বস্তি নেই—মুখে কেবল এক শব্দ—পাখী দাও, চাঁদ দাও, তারা দাও।

একদিন একটা অদ্ভুত আব্দার জানিয়ে বসলেন নিমাই। বললেন

খোঁজ নিয়ে জেনেছি জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবত—দুই ব্রাহ্মণ আজ একাদশীর উপোস করে বিষ্ণু পুজোর জন্যে কতোরকমের নৈবেদ্য সাজিয়েছে। আমাকে ঐ নৈবেদ্য সবটা এনে দাও, নইলে আমি কান্না থামাবো না। কি অলুক্ষণে কথা রে বাবা! কেউ দারুণ বকতে লাগলেন। কেউ হেসে গড়াতে লাগলেন অদ্ভুত এই আব্দারের কথা শুনে।

ঝোঁক সামলাতে কেউ কেউ গেলেন ঐ ব্রাহ্মণদের বাড়ি। তাঁরা তো নিমাইয়ের কথা শুনে হতবাক্। ভাবলেন, তবে কি, এ কোনো দৈবী লীলা? বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, তাঁরা নৈবেদ্য এনে নিমাইকে খাইয়ে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে-বুদ্ধিও বাড়ল. পড়াশুনোয় আরও মতি হল। আর দুষ্টুমির পরিমাণও বেড়ে চলল সেই সঙ্গে। কতো নতুন নতুন ফন্দী তাঁর দুষ্টুমির। একেবারে দুষ্টুর শিরোমণি। দলবল সাঙ্গোপাঙ্গ তৈরি করেও নিয়েছেন নিজের মতো ক'রে। দলের পাণ্ডা সেজেছেন নিজে। যাকে বলে সর্দার। তাঁর জ্বালায় অন্য পাড়ার ছেলের দল অতিষ্ঠ। এঁটে উঠতে পারে না তারা নিমাই-এর দলের সঙ্গে। তাবলে নিজের পাড়া শান্ত থাকে—একথা ভাবার কারণ নেই। পাড়াপড়শিদের বাড়ি থেকে চুরি, ছোটদের সঙ্গে মারামারি লেগেই ছিল।

সবচেয়ে অত্যাচার করতেন গঙ্গার ঘাটে। ধুলোবালি মেখে অথবা গোটা-গায়ে কালি মেখে পাঠশালা থেকে যখন ফেরেন, দেখে ভালও লাগে আর মনে হয় এমন শান্তশিষ্ট ছেলে বুঝি ভূ-ভারতে নেই। পুঁথি-পাতড়া ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়েন বন্ধুদের নিয়ে গঙ্গাগর্ভে। দাপিয়ে বেড়ান গোটা ভাগীরথীকে। সাঁতরে এপার-ওপার। পায়ের জল ছিটকে লাগে সাধু-সন্ন্যাসীদের গায়ে। নিষেধ করলে কে কার কথা শোনে! ধরতে গেলে পিছনে গভীর গঙ্গায় চলে যান। কেউ স্নান করে উঠেছেন—দিলেন ছুঁয়ে তাঁকে। অথবা আরও অসভ্যতা—গায়ে হয়তো কুলকুচিই করে দিলেন। আবার তাঁদেরকে স্নান করতে যেতে হয়।

পুরুষেরা রেগে সোজা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অনুযোগ করেন।

বলেন, তোমার ছেলেটিকে বাপু সামলাও। ওর অত্যাচারে কি আমরা গঙ্গাস্নান ছেড়ে দেবো ? কেউ অনুযোগ করেন জল ছিটানোর, কেউ বলেন—আমিই নারায়ণ বলে সামনে দাঁড়িয়ে নিমাই ধ্যান ভাঙিয়ে পুজো চায়। কারও শিবলিঙ্গ, কারও গায়ের চাদর চুরি করে নিমাই। চুরি করে নৈবেদ্য ফুল, আসন দূর্বা চন্দন—স'ব। স্নানের সময় পা ধরে টানে। একজন বলেন—আমার ছোট ছেলেটার কানে জল ঢুকিয়ে দিয়েছে তোমার গুণধরটি। দলবল নিয়ে বালি ছিটিয়ে দেয় কিছু বললেই। আরও অসভ্যতার কথা শোন জগন্নাথ—মেয়েদের আর পুরুষদের জামাকাপড় মিলিয়ে মিশিয়ে বদল করে রাখে অসভ্য ছোঁড়াটা। তুমি আমাদের বন্ধু মানুষ পুরন্দর—তাই এতোদিন কিছু বলিনি। কিন্তু আর তো পারি না। তাছাড়া ছেলে—সারা দুপুর যদি রোদে জলে এমনি করে প'ড়ে থাকে, ছোট ছেলে তো—অসুখবিসুখও তো করতে পারে। যা হয় একটা করো আর তো পারি না। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে যান পাড়া প্রতিবাসীরা। আর রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন অসহায় পিতা জগন্নাথ মিশ্র। আসুক আজ ছেলেটা, তারই একধার কি আমার একধার।

পুরুষেরা বের হতে না হতেই খিড়কি দরজা দিয়ে ঢোকেন প্রতিবাসী কুমারী আর মহিলারা। তাঁদের অনুযোগ অভিযোগ আরও বিচিত্র। কি আর বয়স নিমাই-এর। কিন্তু এ কেমন বখাটিপনা এই বয়সেই। জামাকাপড় চুরি করেন মেয়েদের। ব্রত করার জন্য আনা ফুল নেন জোর করে ছিনিয়ে। বললে সেই একই দুষ্টুমি-গালাগালি আর জল ছিটিয়ে অতিষ্ঠ করা। 'বালুকা দেই অঙ্গে'—একজনের অভিযোগ। অন্য জন বলেন—'ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতর'। কারও কানে চলে আঁচমকা 'কু' দেওয়া। কারও বা বদন তুলে ধরে বলেন—'এই আমায় বিয়ে করবি—শিবপুজো করে কি হবে ? আমিই বর'। তারপর নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেন। আবার ঢং করে বরও দেন নিমাই—'তোমার পণ্ডিত, ধনবান, রূপবান বর হোক'। হাঁ গা শচী, তোমার ছেলে কি একেবারে কলির কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে উঠেছেন। তোমার ছাও-

য়ালকে এসব বারণ করে দিয়ো। ভদ্দর নোকের ছেলের এ কেমন ব্যাভার! এসব ভালো নয় কিন্তু।

সবাই অনুযোগ করে। একটি মেয়ে মুখ নিচু করে থাকে। তার বুঝি কোনো অনুযোগ নেই। নিমাই-ও তার শান্ত স্বভাবের জন্য তাকে বেশি জ্বালাতন করেন না। তিনি বল্লভ আচার্যের কন্যা—নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া।

অভিযোগ শুনে শচীদেবীর রাগ-দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায়। এতোবড়ো পাজি হয়েছে ছেলেটা। ছোট মেয়েদের কাউকে কাউকে কোলে তুলে নিয়ে শচীদেবী আদর করে বলেন—আজ আসুক নিমাই। তাকে ঘরে বেঁধে রাখবো, যাতে আর সে তোমাদের সঙ্গে কোনো দুষ্টুমি করতে না পারে। শুনে মেয়েরা শচীর পায়ের ধুলো নিয়ে খুশি মনে বিদায় হন। ভাবেন এবারে দুষ্টুটা হয়তো জব্দ হবে।

কিন্তু কে কার কড়ি ধারে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। গোরা রায়ের অত্যাচার উল্টে বাড়ে বই কমে না। আবার মেয়েরা শচীর কাছে এসে জানালেন নিমাই-এর জ্বালাতনের কথা।

এবারে শচী সত্যি করে রেগে গেলেন। নিমাই বাড়ি ফিরতেই ধরে তাঁকে মারতে গেলেন। দস্যি ছেলে, পারবেন কেন? হাত ছাড়িয়ে নিমাই পালিয়ে গিয়ে একেবারে আস্তাকুড়ে। রাগে দুঃখে শচী চুল ছিঁড়ে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। কি জানি কি দয়া হল নিমাই-এর। উঠে এলেন শেষে এবং স্নান করে বাড়ি ফিরলেন।

পুরুষেরাও আবার একদিন পুরানো অভিযোগ নিয়ে এলেন পুরন্দর মিশ্রের কাছে। এবারে জগন্নাথ ঠিক করলেন শাস্তি দিতেই হবে ছেলেকে। রেগে টং হয়ে লাঠি হাতে নিমাইকে শাস্তি দেবার জন্যে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটলেন।

অমনি যে কুমারীরা অভিযোগ নিয়ে শচীর কাছে ছুটে যান, তাঁরা দেখলেন একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে। আহারে, এমন অপরূপ অঙ্গে কালি প'ড়ে যাবে। অম্‌নি তাঁরাই সাবধান কার দিলেন নিমাইকে—পালাও পালাও। তোমার বাবা আসছেন।

নিমাই তাড়াতাড়ি দলবল ছেড়ে উধাও। যাবার সময় সঙ্গীদের বলে গেলেন—এই শোন্, বাবা এলে বলবি, কই নিমাই তো এখনো স্নান করতে আসে নি। সে তো এই পথ দিয়ে পাঠশালা থেকে এসে বাড়ির দিকেই রওনা হলো। আমরা এখানে সে ফিরে আসবে বলে অপেক্ষা করে আছি। এই বলে অন্য পথ দিয়ে পালালেন নিমাই।

জগন্নাথ ঘাটে এসে পৌঁচেছেন ইতোমধ্যে। চারদিক খোঁজ করেও কোথাও পেলেন না ছেলেকে। ছেলের সঙ্গীদের ধরে জিগ্যেস করলেন কোথায় গেছেরে হতচ্ছাড়া পাজীটা! তারা একেবারে অম্লান বদনে মিথ্যে কথাটা বলে দিলে—নিমাই? সে তো আজ চান করতে আসে নি এখনও। সে তো পাঠশালা থেকে এই পথ ধরে বাড়ি গেলো। আমরা তো তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।

অমনি জগন্নাথের রাগ গিয়ে পড়লো অভিযোগকারীদের উপর—তবে কেন এরা মিছি মিছি তাঁর ছেলের নামে বলে!

তাঁদেরকে বলতেই তাঁরা বললেন—ঠিক আছে, তোমার ছেলে তোমার ভয়ে পালিয়েছে। এবার দুষ্টুমি করলে, আমরাই ধরে তোমার কাছে নিয়ে যাবো তোমার নিমাইকে। জগন্নাথ আর কি করেন। ভাবলেন আত্মসমর্পণ করাই ভালো। বললেন—আচ্ছা ভাই, ঐ ছেলে তো তোমাদেরও ছেলে, ওর দোষ তোমরা ধ'রোনা। এই বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন জগন্নাথ মিশ্র।

এদিকে অন্যপথ দিয়ে বাড়ি এসে পোঁচেছেন নিমাই। হাতে পুঁথি-পত্তর, সোনার অঙ্গে কালির কালিমা।

বাড়িতে ঢুকেই একেবারে সুবোধ বালকের মতো মাকে ডেকে বল-লেন—মা গো, মা কই মা, মাগো তেল দাও। চান করে আসি। গায়ে স্নানের চিহ্নমাত্র নেই। শচী হাতে তেল ঢেলে দেন, গৌরের গায়ে কলমের কালি দেখেন—আর মনে মনে ভাবেন—তবে যে মেয়ে-গুলো বলে গেলো যে নিমাই গঙ্গার ঘাটে তাদের জ্বালাতন করছে। পরণের কাপড়ও তো ভিজে নয়।

এদিকে জগন্নাথও বাড়ি ফিরেছেন। ফিরেই দেখেন বিশ্বম্ভর তেল

মাখছেন। বাবাকে দেখে একেবারে আদর করে কোলে চড়ে বসলেন নিমাই। অবাক্ হলেন জগন্নাথও। ঠিকই তো বলেছে ওর সঙ্গীসাথীরা! ও তো পাঠশালা থেকেই সোজা বাড়ি এসেছে।

কোলে নিয়ে আদর করতে করতে জগন্নাথ বললেন—সোনার চাঁদ আমার—কেন গঙ্গার ঘাটে এতো দুষ্টুমি কর। তোমার কতো বুদ্ধি। তুমি কতো পণ্ডিত হবে। তুমি ঠাকুরপুজোর জিনিসপত্র পর্যন্ত নষ্ট করো, তোমার কি ভয় করে না ঠাকুর-দেবতার?

নিমাই হেসে বলে ফেলেন নির্ভেজাল মিথ্যেটি—বাবা, ওরা কেন মিথ্যে মিথ্যে করে আমার নামে বলে? এইতো দেখতেই পাচ্ছ—আমি চানই করতে যাইনি। দেখো বাবা ওরা যদি আমার নামে মিছিমিছি করে তোমার কাছে লাগায়, তাহলে আমিও ওদেরকে ছেড়ে দেবো না।

এই বলে তেল মাখতে মাখতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হল নিমাই। বন্ধুদের গিয়ে বলেন—কেমন ফন্দী করেছিলাম। বাবা বুঝতেই পারলেন না।

গঙ্গার জল মাতাল করতে লাগলেন নিমাই, আর এদিকে জগন্নাথ-শচী ভাবেন—একি হল? একী মায়া? তবে কি নিমাই ভগবান?

আমরা দেখছি নিমাই একটি দুষ্টুর শিরোমণি। আর ভাবছি এমন দুষ্টুমি করাটাই বুঝি ঠিক। তাহলেই অমনি নিমাই-এর মতো বড়ো মানুষ হতে পারবো! তা যদি সত্যিই হত!

৬

নিমাই-এর ছেলেবেলা আর পাঁচটা দুষ্টু ছেলের মতো কাটতে লাগল। মা একটু বেশি আদর-আস্কারা দেন। জগন্নাথ কর্তব্যবোধে স্নেহ-শাসন করেন। ভালবাসতেন, ভয় করতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপকে। সেই বিশ্বরূপ চলে গেছেন। নিমাই এতোকাল পাড়ার পাঠশালায় না হয় বাড়িতে বসেই পড়াশুনো কর-ছিলেন। দাদা চলে যেতেই মা-বাবাকে প্রবোধ দিয়ে শিশু নিমাই বল-লেন— তোমরা ভাবছ কেন? আমি একাই দাদারও হয়ে তোমাদের

সেবা-শুশ্রূষা করবো। শুনে মা-বাবার বুক শোকে-দুঃখে একদিকে যেমন ভেঙে পড়ে, আরদিকে তেমনি গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশেষ সান্ত্বনা পান। বিশ্বরূপ চলে যেতেই বিশ্বম্ভর কেমন যেন বদলে গেলেন। কেমন যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। আর দুষ্টুমিতে তেমন মন নেই, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করে এখন ঘরেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। আর মন দিয়ে পড়াশুনো করেন। শচী-জগন্নাথ নিমাই-এর এই হঠাৎ পরিবর্তনে যেমন আনন্দ পেলেন। তেমনি ভাবতে লাগ-লেন—এমনটি কেন হ'ল? তবে কি বিশ্বম্ভরও—

জগন্নাথের গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর সমস্ত মন ভরে উঠল। শ্রীহরি শ্রীহরি বলে ভয়নাশন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন তিনি।

মনে হল তাঁর বিশ্বরূপের গাম্ভীর্য আর অধ্যয়নে মনোযোগের কথা। নিমাইও যে ঠিক তেমনি হয়ে উঠছে। পড়াশুনো করে নিমাইও কি তবে ঐ বড়োটার মতো তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে উঠতে চাইছে। আর তার পরেই সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবে বাড়ী ছেড়ে? সমস্ত শরীর দিয়ে একটা আশ-ঙ্কার শিহরণ বয়ে গেল তাঁর। শ্রীহরি শ্রীহরি বলে উঠলেন আবার।

শচীদেবীর কাছে গিয়ে বললেন—দেখ বাপু, আমার ভাল ঠেকছে না। অনেক সন্তান ম'রে আমার বিশ্বরূপ। আর তারো কত বছর পরে এল বিশ্বম্ভর। বিশ্বরূপকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারলাম না! বিশ্বম্ভরটাও কি অমনি বাউলে হয়ে যাবে? ওর পড়াশুনো বন্ধ করে দিলাম বাপু। মুখ্যু হয়েই ও আমাদের বুকজোড়া ধন হয়ে বেঁচে থাক—'মূর্খ হৈয়া মোর ঘরে রহুক নিমাই।'

জগন্নাথ পুত্রের পড়াশুনো বন্ধ করে দিলেন। প্রবল আপত্তি জানা-লেন শচী দেবী— সে কি কথা, বামুনের ছেলে, তোমার ছেলে হয়ে আকাট মুখ্যু হয়ে ঘরে বসে থাকবে। তা হবে না বাপু! কিন্তু কোনো অনুনয় বিনয়ে টললেন না জগন্নাথ। নিমাইয়ের পড়া বন্ধ হল।

বাবাকে ভালমতো চিনেছেন নিমাই। বুঝেছেন এই বয়সেই যে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না, বাবার কথার নড়চড় হবে না।

কিন্তু মনে মনে দুঃখ পেয়ে ঠিক করলেন যে, ব্যবস্থা তিনি নিজেই নেবেন। এই বলে আবার আরম্ভ করলেন পুরনো দুষ্টুমি। আবার নবদ্বীপ মাতিয়ে বেড়াতে লাগল জগন্নাথ মিশ্রের 'মুখ্যু' ছেলেটা। পাড়াপ্রতিবাসীরা আবার অনুযোগ-অভিযোগ নিয়ে জগন্নাথের বাড়িতে যখন তখন আসতে লাগলেন। শচী এসে সস্নেহে কোলে টেনে নিয়ে বলেন—এমন করে দুষ্টুমি কি করে রে বাবা। দেখবি, এবারে আমার যে দিকে দুচোখ যায়—আমি চলে যাবো। একটু লক্ষ্মী সোনা আমার !

দুচোখে অভিমানের জল টলটল করে গোরা বলেন—আমার কি দোষ মা, আমাকে পড়া ছাড়িয়ে দিয়েছ, আমি তো মুখ্যুর মুখ্যু, আমি কি করে ভালো হবো মা ?

শচী গিয়ে জগন্নাথকে সব কথা বলেন। জগন্নাথ চুপ করে ভাবেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও জগন্নাথকে ডেকে বলেন—একী কথা শুনছি পুরন্দর ? তোমার ঐ হীরের টুকরো ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিয়েছ ? না, না, এতো ভালো কথা নয়। চারদিক থেকে নিন্দে শোনা, তাতে মনে লাগল জগন্নাথের। কি করেন জগন্নাথ মিশ্র। বাধ্য হয়ে আবার ছেলের পড়াশুনোর দিকে নজর দিলেন।

অমনি গৌরের দুষ্টুমি কমে গেল। আর তিনি রাতে কম্বল চাপা দিয়ে ষাঁড় সেজে পরের কলাগাছ ভেঙে কাঁদি ভেঙে আনেন না। বাইরের থেকে গেরস্তের ঘরে শিকল তুলে দেন না। আস্তাকুঁড়ে গিয়ে অশুচি হাঁড়ির কালি মাখেন না, আর তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে শুচি-অশুচির তত্ত্বকথার কচকচিও করেন না।

দেখতে দেখতে নিমাই-এর উপনয়নের দিনও এসে গেল।

নিমাই এখন অন্ধের একমাত্র নড়ি, পিতামাতার চোখের মণি। তাঁর উপনয়ন। অতএব জগন্নাথের আনন্দের অবধি নেই। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি বাড়ি গিঁয়ে তিনি সকলকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন। নানান ধরণের লোক তাঁর ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আনন্দের হাট বসল শচীদেবীর বাড়ীতে।

শুভদিন শুভক্ষণ দেখে নিমাই-এর উপনয়ন হয়ে গেল। কাঁচা

সোনার অঙ্গে একফালি নদীর মতো উড়তে থাকলো শ্বেতশুভ্র উপবীত। গৌরসুন্দর হাতে দণ্ড কাঁধে ঝুলি নিয়ে সমস্ত সেবকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে এলেন।

আবার নতুন করে পড়াশুনোর পাট বসল জগন্নাথের বাড়িতে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের তখন খুব নামডাক সারা নবদ্বীপ জুড়ে। বিশেষত ব্যাকরণ আর শব্দশাস্ত্রে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। চারপাশ থেকে শত শত ছাত্র তাঁর টোলে ব্যাকরণ পড়তে আসে। জগন্নাথ এখানেই ছেলেকে এনে ভর্তি করে দিলেন।

অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস জগন্নাথকে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। বসতে আসন এগিয়ে দিলেন এবং নিমাই তাঁর কাছে পড়তে চায় শুনে বললেন—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। ওকে শেখাবার জন্যে সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।

গঙ্গাদাস নিজে থেকে নিমাইকে ছেলের মতো কাছে রাখলেন এবং খুব যত্ন নিয়ে পাঠ দিতে থাকলেন।

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক এক ক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥

শুধু তাই নয়, হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥

গুরু পর্যন্ত শিষ্যের বিদ্যাভ্যাসে পরাস্ত। এমন মেধাবী ছাত্র পেয়ে গঙ্গাদাসের প্রীতির অবধিমাত্র নেই। তাই

গুরুবলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য হৈবা তুমি বলিলাম দড়॥
প্রভু বলে তুমি আশীর্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য পদ কোন দুর্লভ তাহারে॥

তর্কে গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করে অন্য ব্যাখ্যা করেন নিমাই। সহপাঠী মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য শিষ্যরা প্রথমে

নিমাইকে বালক ভেবে উপেক্ষা করলেও শেষ অবধি তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

তবে আমাদের মনে হয়েছে এই মেধাবী ছাত্রটির মধ্যে বিদ্যা বিনয় দান করতে পারেনি। তাঁর জীবনীকারেরা একে বিদ্যাবিলাস বললেও আমাদের মনে হয়েছে তিনি একটু গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে অকারণ বিদ্যাচর্চা নিয়ে কলহ কর-তেন। ঝগড়া থেকে জল ছোঁড়াছুঁড়ি, বালি ছোঁড়াছুঁড়ি, এমনকি হাতাহাতিও হয়ে যেত মাঝে মাঝে। দুরন্তপনা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না। একে অপরের অধ্যাপকের প্রসঙ্গ পর্যন্ত টেনে এনে তাঁকে অসম্মান করতে ছাড়েন না।

একদিন কয়েকজন পড়ুয়া, বিদ্যেবুদ্ধিতে তাঁরা বেশ একটু অগ্রসর, নিমাইকে ডেকে বললেন, দেখ বাপু ঝগড়াঝাঁটিতে কাজ কি। এসো বরং পরীক্ষা করা যাক্—কার কতটা বুদ্ধি। বৃত্তি পাঁজি টীকার কে শুদ্ধ ব্যাখ্যা করতে পারে। পরীক্ষা হয়ে যাক্।

নিমাই বললেন, ঠিক আছে, যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস কর তোমরা?

অন্যেরা বললেন, বড্ড অহংকার তোমার, তাই না গোরা? বলতো দেখি ধাতুসূত্র।

নিমাই তা তো বললেনই, সঙ্গে আবার নিজের ব্যাখ্যা দিলেন। সবাই যখন তা শুনে অবাক—তখন নিজেই আবার নিজের ব্যাখ্যার ভুল বের করে দিলেন। ধাঁধায় পড়ে গেলেন বন্ধুরা।

কিন্তু ঘরে ফিরে এসে একেবারে ভেরি গুড বয়, দারুণ পড়ুয়া ছেলে নিমাই। তুলসী দিয়ে বিষ্ণুর পূজা সেরে খেয়ে পুঁথি নিয়ে নির্জনে বসে পড়তে থাকেন। শেষে পুঁথি বন্ধ করে নিজেই তার টীকা রচনা করতে বসেন। জগন্নাথ আড়াল থেকে দেখেন আর ভাবেন—খুবই দোষ হয়ে-ছিল এমন গুণের ছেলের পড়া বন্ধ করে দিয়ে। শচীর কাছে গিয়ে পুত্রের কৃতিত্বে গর্ব করেন।

পাড়াপড়শীরাও এসে জগন্নাথকে বলেন, ধন্য তোমার বুদ্ধিমান ছেলে। দেখে নেবে, ও একদিন খুব বড়ো পণ্ডিত হবে। শচী ভাবেন,

কি জানি কেউ যদি ছেলেকে তুক করে তার ক্ষতি করে। স্বামী-স্ত্রী মিলে ভগবানের কাছে তাঁকে রক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানান।

একদিন ঘুম থেকে উঠে জগন্নাথ মুখভার করে শচীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। শচী বললেন, কি হল গো হঠাৎ এই ভোররাত্রে! জগন্নাথ মুখ কালো করে শ্রীহরি নাম উচ্চারণ করে বললেন, মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে একটা স্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখলাম জানো? দেখলাম, আমার নিমাইয়ের মাথা মুড়োনো। পরনে একটা অদ্ভুত সন্ন্যাসীর বেশ। আর সে মুখে অবিরত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নাচছে, হাসছে, কাঁদছে। তার চারিপাশে অদ্বৈত আচার্যরা। তখনি নিমাইকে মনে হল বিষ্ণু, তখনি ব্রহ্মা, তখনি শিব। আরো দেখলাম, নিমাই নেচে-নেচে নগরে কীর্তন করে বেড়াচ্ছে, সারা নবদ্বীপ হরিধ্বনিতে পূর্ণ। কতো লোকে নিমাইকেই স্তব করছে আর গান গাইতে গাইতেই আমার নিমাই নীলাচলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু, এ কি স্বপ্ন দেখলাম ভগবান!

শচী প্রবোধ দেন, কিছু ভেবো না। গোরা আমার ঘরেই থাকবে। দেখছো না ওর পড়াশুনোয় কেমন মন। পড়া ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না ও।

এমনি করে দিন যেতে যেতে জগন্নাথ মিশ্র হঠাৎ একদিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে দিলেন। দুঃখ খুবই পেলেন নিমাই বাবার মৃত্যুতে। কাঁদলেনও অনেক। আর এবার থেকে মায়ের আরও বুকের কাছটিতে চলে গেলেন। এক দণ্ডও যেন মাকে ছেড়ে থাকতে চান না! শচী-দেবীও পুত্রকে বাবার অভাব বুঝতে দেন না। এমনি করেই দুঃখে-সুখে দিন কাটাতে লাগলেন মায়ে-ছেলেতে।

তবুও একটা দিন এমন এল, যেদিন হঠাৎ ভারী রাগারাগি করে বসলেন নিমাই। স্নান করতে যাবার আগে মায়ের কাছে সুগন্ধী আমলকী তেল চাইলেন। আরো চাইলেন মালাচন্দন ইত্যাদি।

মা বললেন, অপেক্ষা করো। আর অমনি দপ্ করে রেগে গেলেন নিমাই। একটু তো বড় হয়েছেন। এতটা দুঃখ মাকে না দিলেই পার-

তেন। রাগের চোটে গঙ্গাজলের কলসী, তেল, ঘি, নুনের ভাঁড়, ঘট ঘড়া সব লাঠি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিলেন।

শিকে থেকে টেনে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন চাল, তুলো, ডাল, বড়ি সব। কাপড়-চাদর—হাতের কাছে যা পেলেন সব টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। ঘরের দেওয়াল, উঠোনের গাছ—লাঠির আঘাত থেকে কিছুই বাঁচলো না। তাঁর চণ্ড মূর্তি দেখে কেউ এগোতে সাহস পর্যন্ত পায় না। শেষমেষ রেগে উঠোনে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

এর মধ্যে শচী দেবী মালা এনে, গঙ্গা-পূজার জন্যে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে এনে আস্তে আস্তে নিমাইয়ের কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে সব গায়ের ধুলো মুছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, বাবা ওঠো, মালা এনেছি, যাও পুজো করগে। বেশ করেছ ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেছ, ওগুলো তোমার বালাই নিয়ে চুলোয় যাক্‌গে।

মায়ের কথা শুনে গৌরচন্দ্র বড়ো লজ্জা পেলেন। রাগ পড়ে গেল তাঁর. গঙ্গায় স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মনের দুঃখ চেপে শচী সব ঘর ধীরে ধীরে গোছাতে লাগলেন।

গৌরচন্দ্র স্নান সেরে এসে তুলসীমূলে জল দিয়ে খেতে বসলেন। খেয়ে পান চিবোতে লাগলেন।

মা কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, রাগ করে এতো সব জিনিসপত্র নষ্ট করে বাবা! তোর পড়াশুনোও হল না। তোর বাবা নেই, কি করে অন্ন সংস্থান হচ্ছে সে শ্রীহরিই জানেন। আজ তো দুটো মুখে দিতে পারলি। কাল কি খাবি জানি নে।

নিমাই এসে বললেন, সে যা হোক ব্যবস্থা ঠাকুর করে দেবেন—আমি এখন পড়তে যাই।

৭

নিমাইয়ের বয়স এখন ষোল-সতেরোর বেশি নয়। টোলে পড়াশুনোর পাঠ সাঙ্গপ্রায়। একদিন তিনি গঙ্গাস্নানে গেছেন, নবদ্বীপের এক সৎ ব্রাহ্মণ বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াও গেছেন সেখানে। কোন্ কিশোর বয়সে এর গায়েও হয়তো দুরন্ত নিমাই বালি ছিটিয়ে

থাকবেন, কিংবা 'এই আমাকে বিয়ে করবি বলে' চাপল্য দেখিয়েছিলেন। বড় শান্ত স্বভাবের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া। সমস্ত নবদ্বীপ রমণীরা যখন চৈতন্যের দুরন্তপনার অভিযোগ নিয়ে শচীর আঙ্গিনায় হাজির হতেন, লক্ষ্মীপ্রিয়া হয়তো কোনো দিন তখন গেছেন। কিন্তু তাঁর বুঝি কোনো অভিযোগ ছিল না। বালিকা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বুঝি চৈতন্য তাই আর উত্যক্তও করতেন না।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া বড়ো হয়েছেন। তাঁর বয়োসন্ধি তাঁকে এনে দিয়েছে লাবণ্য, ব্রীড়া আর শ্রী। অনেকদিন পর স্নানের ঘাটে আবার দুজনের একসঙ্গে দেখা। পরস্পর অপাঙ্গে হাসলেন দুজনে। তারপর দুজনে দুজনের বাড়ির দিকে গেলেন। সে হাসিতে কি ছিল জানি না। হয়তো সেই শৈশবের দিনগুলো মনে পড়েই হাসি এসেছিল। অথবা ভবিষ্যতের দিনের কথা ভেবে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—'হেন মতে দোহা চিনি দোহা ঘর গেলা'। আকর্ষণ একতরফা নিশ্চয়ই ছিল না।

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন। সে বেদনা মাতা শচীকে নিত্য পীড়া দেয়। মাঝে মাঝে ভয় হয়—স্বামী নেই, জ্যেষ্ঠ পুত্রও নেই। এখন যদি বিশ্বম্ভর—তাঁর গোরা যদি তাঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নেয়! তখনই ভাবেন এবার তো নিমাই পণ্ডিত হয়েছে, নিমাই ডাগর হয়েছে, এবার তার বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে বেঁধে রাখাই উচিত হবে।

আবার এও ভাবেন বিয়ে দেবেন কেমন করে? ঘরে তো অন্ন সংস্থান তেমন নেই। এখনও তো নিমাই তেমন রোজগারটি করেনি। আর তাছাড়া বিয়ে দিলে যদি ছেলে পর হয়ে যায়!

এমনি সাত পাঁচ ভাবেন, এমন সময় একদিন বনমালী এলেন শচী দেবীর কাছে। নিমাই তখন বাড়ি নেই। বনমালীর কাজ, ঘটকের কাজ। শচী দেবীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে তাঁর দেওয়া আসনে বসে বনমালী আসল কথাটি সবিনয়ে পাড়লেন। বললেন, মা লক্ষ্মী, নিমাই আমাদের তো দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। আহা-হা, এমন ছেলে ভূ-ভারতে মিলবে না। রূপে-গুণে একেবারে চোখ জুড়িয়ে

যায়! তা মা, আপনি ওর বিয়ের জন্যে একটুও ভাববেন না। বল্লভ আচার্যের কথা তো মা আপনি জানেনই। যেমন বড় বংশ তেমনি সদাচারে থাকেন তিনি। তাঁর একটি মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া। সত্যিই একেবারে মা লক্ষ্মী-সদৃশা, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে সম্বন্ধটি নিয়ে অগ্রসর হই।

শচীমাতা শুনে উত্তর দিলেন, আপনার কথা শুনে ভালই লাগল ঘটক মশাই। তবে কিনা নিমাই আমার বাপ-মরা ছেলে। তার পড়াশুনো এখনও শেষ হয়নি। বিশেষত, সে এখনও রোজগার করে না। তার পড়া শেষ হোক। রোজগার করুক। তারপর না হয় তার বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

বনমালী মুখ কালো করে উঠে পড়লেন। নিমাই তখন বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। বনমালীকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে দেখে একমুখ হেসে জিগ্যেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে বনমালী?

বনমালী বললেন, তোমার মায়ের কাছে বাপধন! তোমার বিয়ের কথা বলতে গেছিলাম। তা তিনি তো আমাকে কোনো আমলই দিলেন না।

শুনে নিমাই একেবারে গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হেসে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন বনমালীকে।

বাড়িতে এসে বোকা বোকা স্বরে মাকে জিগ্যেস করলেন, মা, শুনলাম আচার্য বনমালী এসেছিলেন। তা তুমি তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলনি কেন?

শচীমা মুচকি হেসে শুধু বললেন, ও, আচ্ছা। ছেলের মনের কথা তাঁর কাছে স্পষ্ট করে ধরা দিলো। মনে মনে খুশিও হলেন। তাহলে ছেলের সংসারে মতিগতি হয়েছে। যাক্, এ ছেলে তাহলে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে না, সন্ন্যাস নেবে না বিশ্বরূপের মতো।

পরের দিনই তিনি খবর পাঠালেন বনমালী আচার্যিকে। তিনি আসতেই বললেন, গতকাল যে সম্বন্ধের কথা বলেছিলেন, সেটাই তাড়াতাড়ি দেখুন। আমি রাজী।

খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন বনমালী আচার্য। এবার বুঝি তাঁর পাওনা-থোওনা ভালই হবে। শচীর পায়ের ধুলো নিয়ে বনমালী একেবারে সোজা বল্লভ আচার্যের বাড়ি। সমাদর করে আসন দিয়ে বল্লভ তাঁকে বসালেন। তারপরে প্রায় সগর্বে বনমালী বললেন, আপনার মেয়ে তো ডাগর হয়েছে। তাই না? তা তার একটা ভালো সম্বন্ধ এনেছি। এখন আপনার মনে ধরে কিনা দেখুন। জগন্নাথ মিশ্র তো চলেই গেছেন। তাঁর ঐ ছোট ছেলেটি, ভালো নাম কি যেন, হ্যাঁ বিশ্বম্ভর, ঐ যে আমাদের নিমাই গো, সে তো এক পরম পণ্ডিত, হাজার গুণের নিধি। মায়ের অন্ধের নড়ি, একমাত্র ছেলে। একটা শুভদিন দেখে মেয়েকে ওর হাতে সঁপে দিন, এমন সুপাত্র আর এ তল্লাট খুঁজলে পাবেন না আচার্যি মশাই। এই বলে সব সবিস্তারে জানালেন।

বল্লভ যেন হাতে চাঁদ পেলেন। নিমাই, ঐ গৌরচন্দ্র তাঁর জামাই হবেন, এ তো আশাতীত সৌভাগ্য। বললেন, ঈশ্বরের অশেষ করুণা —এমন পাত্র যদি পাই সে তো আমার কন্যার জন্ম জন্ম তপস্যার ফল। যাই হোক গে, কালক্ষেপে নানান অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা। আপনি এখনই সম্বন্ধ পাকা করার ব্যবস্থা করুন।

একটু থেমে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু আচার্যি মশাই, আমার অবস্থা তো জানেন। নিমাইয়ের মতো পাত্র ধরি, এমন সঙ্গতি তো আমার নেই। কোনো প্রকারে দিন কাটাচ্ছি। লজ্জার সঙ্গেই বলছি, পাঁচটি হরতুকীর বেশি সম্মান করার যোগ্যতা আমার নেই। এখন আপনি যদি ওঁদের মত করাতে পারেন, আমি চিরঋণী থাকি আপনার কাছে।

বনমালীর আনন্দের অবধি নেই। শচী তো পূর্বেই মত দিয়েছেন, এখন কন্যাপক্ষের মতও পাওয়া গেল। সব শুনে শচীও সম্মতি দিলেন। বিনা যৌতুকেই বিবাহ স্থির হল। এখনকার যুগের পণপ্রথার কথা ভাবলে গৌরচন্দ্রকে ও তাঁর মাকে বাস্তবিকই উদার মনে হয়। দিনক্ষণ ঠিক হল, আত্মীয়স্বজনের কাছে খবর গেল। অনেকেই এসে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন।

শুভদিনে অধিবাস হল। একটা ছোটোখাটো উৎসবের আকার ধারণ করল মিশ্র-বাড়ি। গলায় ফুলের মালা পরলেন গৌররায়। বল্লভ আচার্য এসে নিময় অনুযায়ী অধিবাস করিয়ে গেলেন।

এয়োরা এলেন। শাঁখ বাজল কতবার, কতবার হুলুধ্বনি দিলেন পুরনারীরা। শচীমাতা সকলকে খই কলা সিঁদুর পান তেল দিয়ে সম্মানিত করলেন।

নিমাই সেজেছেন বরের বেশে, সে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। গোধূলি লগ্নে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে চললেন বল্লভ আচার্যের বাড়ির দিকে। বল্লভ আচার্য সসম্মানে জামাতা ও আত্মীয়বর্গকে বরণ করলেন।

এদিকে কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকেও সাজানো হয়েছে, লক্ষ্মীর সাজে। পিঁড়ির উপরে তাঁকে আনা হল। আনা হল অন্য পিঁড়িটিতে গৌরাঙ্গ-চন্দ্রকেও। লক্ষ্মীদেবী জোড়হাতে নিমাইকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। মালা-বদল হল। শুভদৃষ্টি হল।

লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বামপাশে বসিয়ে নিমাই মৃদুহাস্য করছেন। যেন হরপার্বতীর মিলন ঘটল।

শেষে বল্লভ কন্যা সম্প্রদান করতে বসলেন। কন্যা সম্প্রদান মুহূর্তে সমগ্র নবদ্বীপ যেন শঙ্খ আর হুলুধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। মন্ত্রোচ্চারণ আর হোমে বিবাহমণ্ডপ যজ্ঞস্থলে পরিণত হল। মেয়েরা সবাই এসে নানা স্ত্রী-আচার পালন করতে লাগলেন। বাসরসজ্জায় সে রাত্রি সানন্দে হল উদ্‌যাপিত।

পরের দিন দোলা এল। সেই দোলায় চড়ে নিমাই লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ছুটে এলেন সেই মোহন মনোহর দৃশ্য দেখতে পাড়াপ্রতিবাসীরা সবাই। ফুলের মালা, চন্দন, গহনা, অঞ্জনে সে এক মায়াময় দৃশ্য। কেউ বলেন হরপার্বতী, কেউ বলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, কেউ বলেন আহা সেজেছেন যেন রাম আর সীতা।

শচীদেবীর এক চোখে জল। অন্য চোখে হাসি। জগন্নাথ মিশ্রের কথা আর বিশ্বরূপের কথা মনে পড়ায় চোখের জল বাধ মানে না। আঁচলে দু চোখ মুছে একমুখ হাসি নিয়ে তখনই শচী ছুটেছেন নববধূকে

বরণ করে আনতে। আজ যে তাঁর অন্ধের নড়ি বিশ্বম্ভর ঘরে লক্ষ্মী এনেছেন। দরিদ্র ঘরের মেয়ে এসে শচীদেবীর অসচ্ছল সংসারের ভার নিলেন।

৮

নিমাই এখন আঠারো বছরের পূর্ণবয়স্ক যুবক। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। সংসারের দায়িত্ব এসেছে কাঁধে অতএব উপার্জনের দিকে মন দেওয়া প্রয়োজন। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন নিমাই। এবার নিজেই একটি টোল খোলার আয়োজন করতে লাগলেন।

নবদ্বীপে তখন বাস করেন এক ধনী ব্যক্তি। তাঁর নাম মুকুন্দসঞ্জয়। যাতে বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটে তার দিকে মুকুন্দসঞ্জয়ের নজর ছিল। প্রায়ই তাঁর গৃহে পণ্ডিতেরা মিলিত হয়ে শাস্ত্রালোচনা করতেন। তিনি যখন শুনলেন তরুণ অধ্যাপক নিমাই একটি টোল খুলে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, নিজে থেকেই তাঁর বিশাল বাড়ির বহির্মহলের একটি ঘর ছেড়ে দিলেন নিমাইকে। নিমাই সেই ঘর পেয়ে পুরোদমে অধ্যাপনা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে বহু ছাত্র এল এবং অচিরেই নবদ্বীপে তিনি 'নিমাই পণ্ডিত' নামে বেশ পরিচিত হয়ে গেলেন।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'handsome is that handsome does'. বাংলাতেও বলে—'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। অনিন্দ্যসুন্দর গৌরসুন্দরের দেহকান্তি। তাঁর মধুর বাক্যকলা, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য সহজেই ছাত্রবর্গ, আত্মীয়বৃন্দ, প্রতিবাসী এমনকি প্রাচীন মানুষদের মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য সম্পর্ক স্থাপন করল। সকলেই যেন তাঁর কাছে আনুগত্য স্বীকার করে একটা তৃপ্তির আস্বাদ পেতেন। প্রবীণ অদ্বৈত শ্রীবাসেরাও পর্যন্ত একটা স্নেহমিশ্রিত ভক্তির দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন।

কিন্তু কেন জানি না—সেই পুরানো কথা, বিদ্যা চৈতন্যকে এই বয়সেও বিনীত করতে শেখায়নি। একটা সদাচাপল্য তাঁর স্বভাবে নিত্য বিরাজ করত। কিছুতেই তাকে তিনি স্ববশে আনতে পারতেন

না। একটা ক্রুদ্ধ, একটা তার্কিক মন তাঁকে যেন কিছুটা দম্ভপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই তাঁর আচরণে তাঁর বন্ধুবর্গ এমনকি প্রবীণ অধ্যাপকেরাও মাঝে মাঝে দুঃখ পেতেন। সত্য বটে, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষা করার মতো, তাঁর ধীশক্তি ছিল অনুকরণযোগ্য। তাঁর রঙ্গপ্রিয়তা ছিল দুর্ভেদ্য—তবুও তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের বিনয়ের সূচনা যেন ঠিক এখনই দেখা দেয়নি। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলনের আগে পর্যন্ত এই চাপল্য তিনি বিসর্জন দিতে পারেননি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

সে সময়ে তাঁর সহপাঠী এবং সমসাময়িকদের অনেকেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। অনেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নবদ্বীপে বসবাস করছিলেন। কৃষ্ণকথা আলাপনে অনেকেই আগ্রহ অনুভব করতেন। এঁদের মধ্যে সহপাঠী মুকুন্দ ছিলেন সুকণ্ঠ। নিমাই প্রায়ই তাঁর সঙ্গে একটু মাত্রাতিরিক্ত পরিহাস করতেন। সুযোগ পেলেই তাঁকে এবং অন্যদের নানা 'ফাঁকি' জিগ্যেস করতেন। শাস্ত্রের এ সব কূট প্রশ্ন শুনে অনেকেই বিব্রত বোধ করতেন। ফাঁকির পাল্লায় যাতে না পড়তে হয়, সেজন্য প্রায়শই তাঁরা নিমাই পণ্ডিতকে দেখলেই পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। গঙ্গার ঘাটে বসে তর্কবিতর্ক করা তাঁর একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে একদিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য যেমন একটা ভক্তদল তৈরি হয়ে গেছিল, তেমনি একদল অস্বস্তিও ভোগ করতেন প্রচুর।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে তাঁর গভীর অনুরাগী এবং ভক্তশ্রেণী মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গেও এই ফাঁকি নিয়ে নিমাইয়ের বিরোধ বাধতো। যেমন একজন মুকুন্দ। এঁকে নিমাই ভালবাসতেন ভিতরে ভিতরে। কিন্তু বাইরে সে ভাব কিছুতেই প্রকাশ করতেন না।

একদিন নিমাই ছাত্রবর্গসহ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই তিনি পথ চলছেন। মুকুন্দও যাচ্ছিলেন স্নানে। নিমাইকে দেখেই পাশ কাটালেন। চৈতন্য বললেন, 'ও বেটা কেবল বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়ে, আমার কথায় কৃষ্ণনাম থাকে না। তাই আমাকে দেখে পালাল।

ঠিক আছে বেটা, কতদিন পালিয়ে থাকবি।' এই বলে খানিকটা গালা-গালি করে নিলেন।

> এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
> পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
> আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
> অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

মুরারি গুপ্ত—পরবর্তীকালে তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি প্রতিষ্ঠাতা—ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। টোলে পড়া-শুনো শেষ করে জাতিব্যবসায় আয়ুর্বেদচর্চায় মন দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন (সে তো নিমাই নিজেও কিছুটা—শ্রীহট্ট থেকেই তো তাঁর পূর্বপুরুষ নবদ্বীপে এসেছিলেন)। নিমাই মুরারিকে দেখলেই তাঁর জাতিব্যবসায় নিয়ে নিদারুণ পরিহাস করতেন। বলতেন, 'ওরে কবিরাজ! লতাপাতা নিয়েই তো তোমার দিন কাটে। তুমি আবার শাস্ত্রচর্চা করো কোন্ সাহসে?' মুকুন্দ চটে গিয়ে তর্ক করতেন। কিন্তু হেরে যেতেন। শুধু তাই নয়, বাঙাল ভাষা নিয়েও তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকেদের সঙ্গে ঠাট্টা পরিহাস করতেন—'বাঙালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।'

শ্রীবাসপণ্ডিত নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে কতো বড়ো। পরম বৈষ্ণব হিসেবেও তিনি নবদ্বীপে সুপরিচিত। নিমাইকে ছেলের মতো ভাল-বাসতেন তিনি। কিন্তু নিমাইয়ের 'ফাঁকি'র কূটকচালি থেকে তাঁরও পরিত্রাণ ছিল না। শ্রীবাস প্রবীণ মানুষ—একটু তিরস্কারের সঙ্গেই বুঝি বলতেন—ওহে দাম্ভিক শিরোমণি, এমনি করেই কি তোমার চলবে! বয়স তো হল, একটু কাণ্ডজ্ঞান হোক তোমার মধ্যে। বিশেষত তুমি হলে একজন সুপরিচিত অধ্যাপক, এই ঔদ্ধত্য তোমাকে ছাড়তেই হবে।' কিন্তু নিমাই একটুও অপ্রস্তুত হতেন না এই প্রাচীন মানুষটির উপদেশেও।

একদিন ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গদাধরকেও তিনি তর্কে অপ্রস্তুত করে

দিলেন। নিমাই তাঁর হাত দুখানি ধরে হেসে হেসে বললেন, তুমি তো ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত, দাও না আমাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে। গদাধর বললেন, 'বল কি জানতে চাও?'

—আচ্ছা, বল তো মুক্তির লক্ষণ কি?

গদাধর সাধ্যমতো বললেন। শুনে নিমাই বললেন, 'তুমি ব্যাখ্যাই করতে জানো না।' এই বলে হাজার কথায় তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তুললেন। গদাধর তো পালাতে পারলে বাঁচেন। দেখে নিমাই বললেন, 'ঠিক আছে, আজকের মতো বাড়ি যাও, কাল এসে বরং বাকীটা বুঝে যেও।'

এসব দেখে-শুনে কেউ ভাবেন এ তো খুব বড় পণ্ডিত হয়েছে দেখছি। কেউ দুঃখ পেয়ে ভাবেন এত বিদ্যা কিন্তু কৃষ্ণনাম ভজনা না করায় সবই ব্যর্থ হল। কেউ বলেন ওকে দেখলেই পালিয়ে যাই ভাই ভয়ে। কেউ বলেন ও ভাই অনেক বড় মহাপুরুষ।

একথা নিমাইয়ের কানেও যায়। নিমাই বলেন, 'শেখাও না তোমরা আমাকে কৃষ্ণভক্তি। সে তো হবে আমার পরম সৌভাগ্য। তবে আমার ইচ্ছা আরও কিছুদিন অধ্যাপনা করে একজন ভাল বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণবধর্ম শিখবো।'

নিমাইকে আমাদেব মনে হতে পারে তিনি শুধু উদ্ধত। শুধু চপল। মানুষকে দুঃখ দেওযাই তাঁর বুঝি পরম কর্তব্য।। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব অমায়িক। সাধারণ মানুষেরা সেজন্য তাঁকে নিজের লোক বলে মনে করত, তাঁকে আপন ভেবে ভালবাসত। সকলের ঘরেই তাঁর অবাধ প্রবেশ, সকলের সঙ্গেই যেন তাঁর পরিহাসের সম্পর্ক। সেখানে তিনি উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত নন, অধ্যাপকের আভিজাত্য সেখানে কোনোদিনই উঁকি দিতে পারে না।

তবে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর দুর্দান্ত স্বভাব কোনো না কোনো প্রকারে সাধারণ মানুষের কাছেও প্রকাশ পেয়ে যেতো। তাঁর ভালবাসা ছিল পুরুষের ভালবাসা—জোর করে, অধিকার খাটিয়ে যে ভালবাসা অপরের প্রেম আদায় করে নেয়।

নবদ্বীপ নগরে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো কোনোদিন কোনো এক তাঁতির বাড়িতে গেলেন। তাঁতি তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম জানালো। নিমাই বললেন—দাও তো বাপু, একখানা ভাল কাপড় এনে দাও তো।

সে কাপড় আনতেই জিগ্যেস করেন—দাম কত ?

—সে আপনি যা দেবেন, তাই নেবো।

—তা তো হল, কিন্তু আমার কাছে বাপু একটাও কড়ি নেই।

—তাতে কি হয়েছে গোঁসাই, না হয় দশ পক্ষ পরই দাম দেবেন। আগে প'রে দেখুন কাপড়খানা কেমন, তার পরেই না হয় দাম দেবেন।

গেলেন হয়তো কোনোদিন কোনো গোয়ালার বাড়ি। সেখানে বসে ব্রাহ্মণদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা শুরু করলেন। পরে হাঁক দিলেন—কি রে ব্যাটা, বসে আছিস যে, দুধ দই আন্।

গোয়ালা আসন পেতে খাতির জানালো। গোয়ালারা সবাই তাঁকে মামা বলে ডাকতো। কেউ বলে—চল না মামা ভাত খাইগে। এই বলে খুশি হয়ে দুধ ঘি দই সর ভালো মাখন সব এনে নিমাইয়ের সামনে ধরে।

এবারে গেলেন হয়তো কোনো গন্ধ বণিকের বাড়ি। সে তাঁকে খাতির জানালো যথারীতি। নিমাই চেয়ে বসলেন ভালো কোনো সুগন্ধি।

—কত দাম চাও ?

—সে আপনিই বলুন না ঠাকুর। আপনার কাছে কি দরদাম করতে পারি ? তবে ঠাকুর এই গন্ধ গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছি। কালও যদি গন্ধ থাকে, আর ধুলেও যদি এই গন্ধ গা থেকে না যায়, তবেই আমাকে দাম দেবেন।

এই বলে ভালো করে নিমাই-এর সর্ব অঙ্গে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলে। সেও এক বেশ রঙ্গ হল।

এবার গেলেন মালাকরের বাড়ি।

—ভালো একটি মালা দাও তো মালাকার। তবে আমার কাছে কোনো পয়সাকড়ি নেই বাপু।

মালাকর হেসে মালা দেয়। এমনি পান্থুরে হেসে দেয় পান। শঙ্খ বণিক তাঁকে ভালো শাঁখা দেয়। সবাই দেয় বিনামূল্যে তাঁর রূপ ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে।

সবার চেয়ে রঙ্গ জমে শান্ত, নিরহঙ্কার, কৃষ্ণভক্ত শ্রীধর পণ্ডিতের সঙ্গে। শ্রীধর বড়ো দরিদ্র। কলার খোলা, থোড়, মোচা বিক্রি করে কোনোপ্রকারে তিনি দিনাতিপাত করেন। এজন্যে তাঁর একটা ডাক-নাম হয়ে গিয়েছিল "খোলা-বেচা শ্রীধর"। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বড় প্রীতি-মধুর। কোনো না কোনো একটা ছুতো করে নিমাই প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে মধুর-জ্বালাতন করে আসতেন।

—ওহে শ্রীধর, মুখে তো দিনরাত হরি-হরি করছ, তবে তোমার এতো দারিদ্র্য কেন? লক্ষ্মীকান্তের সেবা করছ অথচ ভাত-কাপড়ের এত কষ্ট কেন তোমার?

—কই, উপোস তো করিনে। আর এই দেখুন—ছোট বড় যাই হোক—কাপড়ও তো একখানা পরেছি।

—আহা-হা কাপড়ের কি ছিরি! দশ জায়গায় গিঁট মারা। ঘরের চালে খড়েরও তো নামগন্ধ নেই দেখছি। কতো জনেই তো মনসা পুজো করে বেশ সুখে রয়েছে

—ভালো কথাই আপনি বললেন। দেখুন, সকলেরই দিন সমান যায় না। রাজারও রাজভোগ জোটে, আবার পাখিও খুঁটে খায়। দিন তো কাটে। যার যেমন কর্মফল তার দিন তেমনি কাটে।

—আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। তোমার অনেক পয়সাকড়ি আছে। তুমি সে সব লুকিয়ে লুকিয়ে ভোগ করো। আমি সবাইকে ডেকে ডেকে তোমার ধোঁকা দেওয়ার কথা বলে দেবো।

—বেশ পণ্ডিত, ঘরের মধ্যে এসে নিজেই দেখে যান আমার কি আছে আর কি নেই। ভুল বোঝাবুঝিটা আর থাকে কেন?

—না, না, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। এখন আমাকে কি দেবে বল।

—আমি খোলা বেচে খাই। আমি কী জিনিস আপনাকে দিতে পারি বলুন।

—কেন, তোমার তো টাকা পয়সা মাটিতে পোঁতাই আছে। আচ্ছা, সে সব এখন থাক, সে সব পরে নেবো। এখন আমাকে বিনা পয়সায় কলা-মূলো থোড়-মোচা যা আছে তাই দাও তো! ওগুলো যদি দাও, তোমার গোপন ধনরত্নের কথা লোককে বলে দেবো না।

শ্রীধর একটু রেগে অথচ গুণ্ডামির ভয়ে জড়িত কণ্ঠে বললেন—গোঁসাই, টাকা পয়সা দেবার মতো আমার কিছুই নেই। যেমন চেয়েছেন কলা থোড় মোচা যা আছে তা দিচ্ছি। তবে আর ঝগড়া করবেন না কিন্তু। আমার সঙ্গে ঝগড়া করা কি সাজে?

—বেশ, বেশ, বেশ—তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার কোনো বাদ-বিসম্বাদ নেই। তবে হ্যাঁ, দেখো যা দেবে, যেন ভাল জিনিস হয়।

শেষ পর্যন্ত ঐ রকমই হল, শ্রীধর প্রতিদিন নিমাইকে কলা মোচা থোড় যোগান দিতে থাকেন।

এরই মধ্যে মাঝখানে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এবং সে ব্যাপারেই নিমাইয়ের জীবনে একটা দিক পরিবর্তনের সূচনা হল। একথা মনে করলে ভুল হবে যে নিমাই রাতারাতি বদলে গেলেন। কিন্তু গাছের বীজ পুতলে যেমন তা ধীরে ধীরে বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি এই ঘটনা নিমাইয়ের জীবনে বীজের মতো ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। নিমাই কিছুটা ভক্তিমার্গী হলেন। ঘটনাটি হল ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। প্রবল পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা, কিশোরী বধূ, গৃহধর্ম নিয়ে নিমাইয়ের যে জীবন, সেই জীবনপ্রবাহে ঈশ্বরপুরী একটা মোড় ঘুরিয়ে দিলেন যেন।

একদিন ঈশ্বরপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর সেই সুখ্যাত শিষ্যটি প্রায় গোপনে নবদ্বীপে এসে হঠাৎ না বলে কয়ে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে অতিথি হয়ে উঠলেন।

অদ্বৈত তখন পূজা করছিলেন। হঠাৎ এক আগন্তুক দেখে অবাক

হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? মনে হচ্ছে দেখে তুমি একজন সন্ন্যাসী।

শুনে ঈশ্বরপুরী বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন—না, না, আমি শূদ্রেরও অধম শূদ্রাধম। আমি এসেছি আপনার চরণ দর্শন করতে।

সে কথা শুনে উপস্থিত সুকণ্ঠ মুকুন্দ বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদতে লাগলেন। এমনি করে প্রায় আত্মগোপন করে তিনি অদ্বৈতের বাড়িতে থাকতে লাগলেন।

একদিন টোল থেকে পড়িয়ে ফেরার পথে হঠাৎ নিমাইয়ের সঙ্গে পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল ঈশ্বরপুরীর। পুরী জিগ্যেস করলেন—বিপ্রবর, আপনার কি নাম? কোথায় পড়েন বা পড়ান?

নিমাই পরিচয় দিতেই উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—আপনিই নিমাই পণ্ডিত? আমার শতকোটি নমস্কার নেবেন।

নিমাই অনেক সমাদর করে নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের বাড়িতে। শচী তাঁকে অনেক সমাদর জানালেন।

ঈশ্বরপুরী তারপরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি থেকে গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে গিয়ে মাসখানেক বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে নিমাই নিত্যই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসেন। গদাধর পণ্ডিতও যান সেখানে।

একদিন ঈশ্বরপুরী নিজের লেখা 'কৃষ্ণলীলামৃত' পুঁথি গদাধরকে সযত্নে পড়ে শোনালেন।

তারপর একদিন সাহস করে নিমাইকে সেই পুঁথির কথা শুনিয়ে বললেন—আপনি পরম পণ্ডিত। আমার পুঁথির ভুলত্রুটি বাদ একটু দেখে দেন, ভারী উপকৃত হবো।

শুনে নিমাই বিনীতভাবে বললেন—ওকথা বলবেন না। ভক্ত তাঁর অন্তরের বাণী দিয়ে যে কৃষ্ণগুণগান রচনা করেন তাতে কোনো ভুল থাকতে পারে। তাতে ত্রুটি দর্শনও পাপ। যেমন ধরুন, মূর্খলোকে ব্যাকরণ না জেনে বলে 'বিষ্ণায়'। পণ্ডিতেরা বলেন 'বিষ্ণবে'—কৃষ্ণ কিন্তু দুজনের সম্বোধনেই সাড়া দেন।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥

নিমাইয়ের উত্তর শুনে ঈশ্বরপুরী ভাবে গদগদ হয়ে উঠলেন। তবুও বললেন, ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। সে ভুল দেখিয়ে দিলে কোনো দোষ হবে না আপনার।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঈশ্বরপুরী একটি কবিতা আওড়ালেন। নিমাই বললেন, ঐ যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করলেন। ওটি আত্মনেপদী হবে না, ধাতুটির রূপ পরস্মৈপদী করার দরকার।

ঈশ্বরপুরী অনেক বিবেচনা করে পরের দিন বললেন—তাই কি, আমার মনে হয় ওটি আত্মনেপদীই হবে।

তাঁর যুক্তি এবার নিমাই মেনে নিলেন। আর তর্ক তুললেন না। এটা তো নিমাইয়ের চরিত্রবিরোধী। তবুও কেন জানি না। বিনয়ের স্ফূর্তি ঘটল তাঁর মধ্যে। এমনি করেই কি তাঁর চরিত্রে পরিবর্তন সূচিত হল? তাঁর হৃদয়ে প্রথম একটা অনুরাগের গভীর দাগ পড়ল বুঝি সেই প্রথম।

৯

তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে রাতারাতিই একটা পরিবর্তন নিমাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাঁর মধ্যে যে বিদ্বান মানুষটি বাস করত প্রয়োজন ক্ষেত্রে সে তর্ক করতে দ্বিধা পেতো না। নিমাইয়ের জীবনের দু'টি প্রধান কীর্তি হল—'নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াইএগ পণ্ডিত'। তিনি একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক—সে পরিচয়ও তো ভুলে যাওয়ার নয়। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যাপক জীবনের একটা বড়ো কীর্তি হল 'দিগ্বিজয়ী' কেশব-কাশ্মীরীকে তর্কে পরাস্ত করা।

সে সময়ে কোনো কোনো পণ্ডিত 'দিগ্বিজয়ী' আখ্যা লাভের জন্য বের হতেন। এ যেন অনেকটা রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো। শিষ্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে কোনো কোনো বিজ্ঞ পণ্ডিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলিতে হাজির হতেন এবং সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে

বিতর্কে লিপ্ত হতেন। বিতর্কে পরাস্ত করতে পারলে অন্যত্র যেতেন। এইভাবে জয়টীকা লাভ করে প্রায় রাজ-রাজড়াদের মতো লোকজন সেপাই শাস্ত্রী নিয়ে হৈ-চৈ গণ্ডগোল করে বিজয়ীর মতো ঘুরে বেড়াতেন।

এমনিই এক উপাধি-লিপ্সু পণ্ডিত ছিলেন কেশব-কাশ্মীরী। গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চীপুরী, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র প্রভৃতি দেশে আপনার বিজয় পতাকা উড়িয়ে অবশেষে এলেন নবদ্বীপে। কারণ এখানে বাস করেন 'অধ্যাপক শিরোরত্ন বিপ্ররাজ-গণ'। এঁদের কাজই হল নিরন্তর শাস্ত্রচর্চা। কেশব-কাশ্মীরীর কানে এই নবদ্বীপের বিদ্যাগৌরবের কথা গিয়ে পৌঁচেছিল। এমনকি অধ্যা-পক পণ্ডিত শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের কথাও।

শোনা যায় তিনি নাকি ছিলেন একেবারে বাগ্‌বাদিনীর বরপুত্র। জিহ্বায় তাই নিত্য কাব্যস্ফূর্তি ঘটেই আছে। হাতি ঘোড়া নিয়ে মিছিল করে নবদ্বীপে কেশব-কাশ্মীরী আসতেই পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত হল। এই বুঝি নবদ্বীপের খ্যাতি যায়, মান যায়। কে এই বিপদে নবদ্বীপকে রক্ষা করবে? বাণীর বরপুত্রকে পরাস্ত করা তো মুখের কথামাত্র নয়। তাঁরা সবাই আনমনা হয়ে রইলেন অনুক্ষণ।

এ-সব খবরে যখন নবদ্বীপ উত্তাল, তখন ছাত্র-শিষ্যেরা এসে নিমাইকে, অধ্যাপক বিশ্বম্ভরকে জানালেন যে, এক দিগ্বিজয়ী বীর এসে পাণ্ডিত্যের জয়পত্র নিয়ে সব জায়গা জয় করে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর অনেক হাতী, ঘোড়া, দোলা আর লোকলস্কর। নবদ্বীপে এখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যদি কেউ তাঁর সামনে আসতে না চান তবে তাঁকে যেন পণ্ডিত সমাজ জয়পত্র লিখে দেন।

একথা শুনে নিমাই পণ্ডিত একটু মুচকে হাসলেন। বললেন, অহংকার হচ্ছে পতনের মূল। ওর যখন এত অহংকার হয়েছে, তখন ওকে ডুবতেই হবে। ফলবান গাছ আর গুণবান মানুষ সর্বদাই নম্র হয়। ওর এতো অহংকার কিসের? ওকে আমি নস্যাৎ করে দেবো।

শিষ্যরা মনে মনে আনন্দিত হলেন। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করতে লাগলেন। কারণ নিমাই একে বয়সে তরুণ, তাতে শুধুমাত্র ব্যাকরণ আর শব্দশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁর পক্ষে কি ঐ সর্ব-শাস্ত্রে বিশারদ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করা সহজ হবে? একে তো শুধু শাস্ত্রের ফাঁকি দিয়ে কিস্তি মাৎ করা যাবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পড়ুয়াদের নিয়ে নিমাই এসে গঙ্গাতীরে বসেছেন। শাস্ত্রালোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে পড়েন। মন কেবলই দিগ্বিজয়ীর কথা ভেবে চলেছে। কি করে ঐ দাম্ভিক অহংকারীর দর্পচূর্ণ হবে একথা ভাবতে ভাবতেই ঐ অন্যমনা ভাব।

এই সব ভাবতে ভাবতেই কেশব-কাশ্মীরী ডঙ্কা বাজিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, ভাগীরথীর জলে চাঁদের জ্যোৎস্না কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গোরা রায়ের দিব্যকান্তির সে কী অপূর্ব শোভা! মুখে মৃদুমন্দ হাসি। দুটি আয়ত আঁখিও যেন আসন্ন যুদ্ধজয়ের প্রত্যয়ে উজ্জ্বল। দুটি ঠোঁটের পাশ দিয়ে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি। লাল লাল ঠোঁট দুটি বঙ্কিম। গোটা মাথা জুড়ে দোদুল দোদুল চাঁচর কেশরাজি। পরিধানের বস্ত্র যোগপট্ট ছাঁদে বাঁধা। বাম উরুর উপর ডান পাটি রেখে মৃদুস্বরে শিষ্যদের কাছে শাস্ত্রের অনুপম ব্যাখ্যা করে চলেছেন। শিষ্যরা চারপাশে, বিশ্বম্ভর গ্রহস্পতির মতো বসে আছেন।

এই নিরুপম দৃশ্য দেখে দিগ্বিজয়ী বিস্ময়ে ডুবে গেলেন। একবার মনে হল—এই কী সেই নিমাই পণ্ডিত! আবার ভাবলেন—সে কী এতো মনোহর! শেষে এক শিষ্যকে ডেকে জিগ্যেস করে নিঃসন্দেহ হলেন।

—ওঁর কি নাম?

—উনি—উনি নবদ্বীপের বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত। আপনি কে?

কেশব-কাশ্মীরী আত্মপরিচয় দিলেন এবং একটু এগিয়ে গিয়ে গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে নিমাই পণ্ডিতের সভায় এসে বসলেন।

সাদর আহ্বান জানালেন বিশ্বম্ভর রায়। সৌজন্যমূলক কিছু কথা-বার্তা হল।

তারপরে নিমাই সবিনয়ে বললেন—শুনেছি আপনি মহৎ কবি। যা কিছু প্রত্যক্ষ করেন, তাকেই আপনি অক্লেশে কাব্যরূপ দান করতে পারেন। কোনো বস্তুই আপনার কাব্য-প্রতিভার কাছে অবর্ণনীয় থাকে না। আজ বড় জ্যোৎস্না। ভাগীরথী আজ মনোহরা শোভা ধারণ করেছেন। আপনিও ভাগ্যক্রমে এমন একটি সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসেছেন। আপনি যদি এই মহিমাময়ী গঙ্গাদেবীর মহিমা কীর্তন করে কিছু কাব্যরসে আমাদের সিক্ত করেন, একান্ত বাধিত ও প্রীতিলাভ করবো। আমাদের সঞ্চিত পাপের মোক্ষও হবে তাতে।

দিগ্বিজয়ী বাণীর বরপুত্র। তাঁর জিহ্বা কাব্যসৃষ্টিতে সদা প্রস্তুত। নিমাইচাঁদ বলতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঙ্গার মাহাত্ম্য কবিতায় ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তাঁর বর্ণনা যত দ্রুত, তত ছন্দোময়। মনে হল একটা মৃদু গর্জন ক্রমাগত উত্তাল হতে উত্তালতর হচ্ছে। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। এমন অপূর্ব কাব্যরস তাঁরা পূর্বে আস্বাদন করেননি। গোরারায়ও পুলকিত। বিচিত্র সব শব্দ আর নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এই শতশ্লোকী গঙ্গাবর্ণনা। প্রায় এক প্রহর ধরে সুরে ছন্দে তালে লয়ে দিগ্বিজয়ী তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক শ্লোক আবৃত্তি করে গেলেন।

দিগ্বিজয়ী থামতেই পরিতৃপ্ত গৌরসুন্দর সবিনয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে জানা-লেন—আপনি যে ভাবে কবিতায় গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন, তা আপনারই উপযুক্ত। তবে আপনার কবিতায় আপনি এমন বহু শব্দের যোগ ঘটিয়েছেন যা আমাদের বোঝার অতীত। আপনি নিজেই নিজের করা একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করুন। আপনি শব্দের যা অর্থ করবেন, সেটাই ঠিক হবে।

এই বলে গৌরসুন্দর দিগ্বিজয়ীকৃত একটি শ্লোক মুখস্থ বলে, সেই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে দিতে বললেন। এবারে বিস্মিত হবার পালা কেশব-কাশ্মীরীর। তিনি বললেন—তুমি আমায় অবাক করলে পণ্ডিত। আমি তো ঝড়ের মতো সব শ্লোক বলে গেলাম। তুমি কেমন

করে সেই সব শ্লোক মনে রেখেছ ? এ তো কম আশ্চর্য প্রতিভার কথা নয় !

গৌরসুন্দর হাসলেন। একটু অহঙ্কারের হাসি বইকি ! অহঙ্কারের কাঁটা অহঙ্কার দিয়েই তো তুলতে হবে। অতএব গোরারায় বললেন—আপনি যে সরস্বতীর বরে অভূতপূর্ব কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়েছেন, হয়তো তাঁরই বরে আমি শ্রুতিধর।

একটু যেন ঘাবড়ে যাবার পর সামলে নিয়ে দিগ্বিজয়ী নিজকৃত ওই বিশিষ্ট শ্লোকটির ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। খুব মনোযোগ সহকারে নিমাই সে সব ব্যাখ্যা শুনলেন।

ব্যাখ্যা শেষ হতেই তিনি সহাস্যে এবং সবিনয়ে নিবেদন করলেন—পণ্ডিত, অপূর্ব আপনার শ্লোক, ততোধিক অপূর্ব আপনার ব্যাখ্যা। কিন্তু যদি অপরাধ না নেন, তবে বলি—ঐ ব্যাখ্যার আদি মধ্য এবং অন্তে—অন্তত তিন জায়গার ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারের দোষ আছে। শাস্ত্রমতে সেগুলি শুদ্ধ নয়। এগুলো যদি না থাকত তাহলে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর শ্লোক অন্য কারো দ্বারা রচনা সম্ভব হত না। এখন আপনি বলুন তো—কেন ঐ দুষ্ট শব্দ আর অলঙ্কারের ব্যবহার আপনি করলেন ; এ বিষয়ে আপনি কি অনবহিত ছিলেন ?

দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত এবং হতবাক্। তাঁর শ্লোকের ভুল ধরতে পারে, দুনিয়ায় এমন কেউ আছে নাকি ? তিনি কি ভোজবাজির কবলে পড়েছেন ? এ কী স্বপ্ন না, এ মায়া ? কথা বলতে ভুলে গেলেন তিনি। সাময়িকভাবে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে একটা জড়তা এসে তাঁকে আক্রমণ করলে যেন।

কিন্তু এতো সহজে হার মেনে নেবার পাত্র তিনি নন। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ভারতের সব জায়গায় জয়ধ্বজা বেঁধে এসে এই বালকের কাছে হার স্বীকার করতে তাঁর প্রবীণ হৃদয় অস্বীকার করল। মরীয়া হয়ে উঠলেন তিনি। ব্রাহ্মণ পাঁচ-সাতবার চেষ্টা করলেন গৌরসুন্দরের দোষদর্শন ভুল প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু বার বার পরাস্ত হয়ে গেলেন। তার সমস্ত তর্ককুতর্কে পরিণত হয়ে গেল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে

তাঁর কাছে যেন অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। ধীরে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং স্তব্ধও হলেন।

কি জানি এখনও যদি কিছু অহঙ্কার থেকে থাকে ভেবে নিমাই তাঁকে বুঝি একটু শিক্ষা দিতে চাইলেন। সবিনয়ে বললেও সেই বলায় বোধহয় একটু ব্যঙ্গের জ্বালাও মিশে ছিল। তিনি বললেন—প্রভু, আমার কাছে কিছু সময় বিদ্যাচর্চা করা প্রয়োজন আপনার আছে।

দিগ্বিজয়ী চোখ তোলেন না। তাঁর সমগ্র শিষ্যবৃন্দ গুরুর অপমানে আজ স্তব্ধ, একটি কথাও বলছেন না তাঁরা। নিমাইয়ের শিষ্যরা তাঁদের অবস্থা দেখে গুরু-গৌরবে একেবারে যেন ফেটে পড়তে চাইছেন। ওষ্ঠে তর্জনী দিয়ে নিমাই তাঁদের সংযত হতে বললেন। তাঁরা হেসে ওঠার উদ্যোগ করতেই তাঁদের শাসন করলেন গৌরসুন্দর। পরাজিতকে আর আক্রমণ করা অনুচিত। মিষ্ট বাক্যে কেশব-কাশ্মীরীকে তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—আপনি আজকের মতো আসুন। আপনি পরিশ্রান্ত। বাড়িতে নিরাপদে ফিরে যান আর বিশ্রাম করুন। এ দিকে রাত্রিও গভীর হয়েছে। আগামীকাল পুনশ্চ আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসা যাবে। এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কারণ কি। ঘরে গিয়ে আরও শাস্ত্রালোচনার সুযোগ আছে: তাতে আগামীকালের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সহজ হবে। আমিও আজ উঠি। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

নিমাই শিষ্যদের নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর অধ্যাপক জীবনের এ এক গভীর স্বীকৃতির দিন। এ এক মনোরম পরিতৃপ্তির ক্ষণ। দিগ্বিজয়ী গঙ্গাতীর যেন আর ত্যাগ করতে পারছেন না। স্তম্ভের মতো বসে আছেন। ভাবছেন একমনে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক, বেদান্তে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে পরাস্ত করতে পারলেন না কেউ সারা ভারত জুড়ে, আর এক ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রের অধ্যাপক আমাকে এভাবে পরাস্ত করলো! তবে কি দেবী সরস্বতীর কাছে আমি কোনো অপরাধ করেছি?

ভাবতে ভাবতে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। সারারাত দু চোখের

পাতা এক করতে পারলেন না। একটুও নিদ্রা এসে তাঁকে চিন্তামুক্ত করে স্বস্তি দিতে পারলেন না। রাতে স্বপ্ন দেখলেন সামান্য যে ঘুম-ঘোর এসেছিল তারই মধ্যে।

সকালে উঠেই সংকল্প স্থির করে ফেললেন তিনি। শয্যাত্যাগ করে সোজা চললেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়ির দিকে। একথা অবশ্য লিখেছেন বৃন্দাবন দাস। তিনি আরও লিখেছেন নিমাইয়ের পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম্ করতেই নিমাই তাঁকে বুকে তুলে আলিঙ্গন জানালেন। তৎপর উভয়ের বিনয়। তারপরেই কাশ্মীর-কেশবের মোহমুক্তি ঘটল।

অন্য মতে এবং সম্ভবত এটাই ঠিক, দিগ্বিজয়ী খুব ভোরে উঠে গভীর লজ্জায় গোপনে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন। নবদ্বীপ জয় আর তাঁর হল না। দিগ্বিজয়ী আখ্যায় তাঁর কলঙ্ক পড়ল। মনে মনে তাঁর যে অহঙ্কার পর্বতাকার ধারণ করেছিল, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নিমাই পণ্ডিতের জয়জয়কারে পরের দিনের নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ মুখর হয়ে উঠল। যাঁরা এতোদিন তাঁকে অর্বাচীন জ্যাঠা পণ্ডিত ভাব-ছিলেন—তাঁরাই এখন তাঁকে গভীর ও আন্তরিক সম্বর্ধনা জানালেন।

নিমাইয়ের ছাত্রজীবনের একটি মহৎ ঘটনা এ সময়েই কিছু আগে ঘটেছিল। এ ঘটনা থেকে তাঁর স্বভাব-ঔদার্য এবং তিনি যে ধীরে ধীরে বিনীত হয়ে পড়ছিলেন, সে বিষয়ে বেশ ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ছাত্রজীবনে নিমাই একসময়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ন্যায়শাস্ত্র পঠন-পাঠন করে-ছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা-বিজয়ী ন্যায়াধীশ পণ্ডিত। যাঁরা মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র পড়ার সুযোগ পেতেন না, তাঁরা সকলেই এই শ্রুতিধর পণ্ডিতের টোলে এসে ন্যায়শাস্ত্র পড়তেন। এমনি তাঁর এক ছাত্র ছিলেন রঘুনাথ—পরবর্তীকালে যিনি গুরুর মতোই এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হিসেবে পরিগণিত হন। রঘুনাথ মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের কাছে পরে নব্যন্যায় শিক্ষা করেন। মূল গ্রন্থ ও টীকা মিলে প্রায় ৪০টি বই লেখেন তিনি।

কিন্তু তাঁর বই লেখা নিয়ে নিমাইকে জড়িয়ে একটি মনোরম উপা-

খ্যান আছে। নিমাইও বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। রঘুনাথ ও নিমাই দুজনেই প্রতিদিন একসঙ্গে বাসুদেবের টোলে পড়তে যেতেন। তাঁদের বাড়ি আর বাসুদেবের টোলের মাঝখানে একটা সোঁতা ছিল। সেটি পার হয়ে তবেই টোলে যেতে পারতেন তাঁরা। বর্ষাকালে সোঁতাটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, খেয়ার সাহায্য ছাড়া পারাপারের কোনো সুযোগ থাকতো না।

এমনি একদিন খেয়ায় পার হচ্ছেন দুই সতীর্থ। নিমাই দেখলেন রঘুনাথ যেন কেমন একটু বিষণ্ণ, অন্য দিনের মতো হাসিখুশি নেই। চোখ দুটিও যেন কেমন অভিমানে টলোটল। নানা কথা প্রসঙ্গে নিমাই বললেন, জানো রঘুনাথ, আমি একটি ন্যায়সূত্রের টীকা রচনা করেছি। কেমন হয়েছে বল। আমি তোমাকে পড়ে শোনাই।

এই বলে রঘুনাথকে টীকাটি গুরুগম্ভীর স্বরে পড়ে শোনালেন। তাল পাতার পুথিটির পাতা একটি একটি করে তিনি খুলে পড়েন আর রঘুনাথের চোখের পাতা একটু করে অশ্রুসিক্ত হয়। বিস্ময় আর হতাশা কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুনাথকে গ্রাস করে নিলে।

শুনতে শুনতে এক সময় রঘুনাথ একেবারে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। নিমাই অবাক্। তাঁর টীকায় তো এমন কোন ব্যাখ্যা নেই, যা শুনে রঘুনাথ কাঁদতে পারেন! তিনিও একেবারে আকুল হয়ে উঠলেন। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করলেন; কী হলো রঘুনাথ, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে কোনো দুঃখ দিয়েছি? তোমার শরীর ভাল নেই? বাড়ির সকলের কুশল তো? আমায় সব খুলে বল।

কান্নায় রঘুনাথের গলা একেবারে বুঁজে গেছে। তারই মধ্যে কোনো রকমে যা বললেন তা এই রকম—

—দেখো নিমাই, খুব লজ্জার সঙ্গেই বলছি, আমিও বহু পরিশ্রমে ন্যায়ের একটি টীকা লিখেছি।

—খুব ভাল কথা তো। তাতে কাঁদবার কি হয়েছে?

—না, না, কাঁদছি না তো! আমার কি ধারণা ছিল জানো?

আমার ধারণা ছিল, এমন ভালো, এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর বিশ্বস্ত টীকা আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না।

—সে তো খুব ভাল। আমাকে কিন্তু পড়ে শুনিও ভাই।

—ছি, ছি, সে অহংকার আজ আমার ঘুচে গেল। তোমার পুঁথি শুনে আমি বুঝতে পারছি তুমি কতো বড়ো পণ্ডিত এবং তোমার পুঁথি কতো ভালো হয়েছে। কিন্তু একটা আশঙ্কার জন্যে আমি কেঁদে ফেলেছি ভাই।

—কী তা!

—আমি বুঝছি আমার যশ হবার কোনো উপায় নেই। তোমার টীকার কাছে আমার টীকা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। এটিকে লোকে একটুও আদর করবে না। আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেলো বিশ্বম্ভর!

একটু গম্ভীর থেকে হো হো করে হেসে উঠলেন তরুণ নিমাই।—'ওমা এ জন্যেই তোমার এতো দুঃখ। এ জন্যেই তোমার এতো কান্না! দূর বোকা! তুচ্ছ একটা ন্যায়ের টীকা। তার জন্যে আমি তোমার মনোকষ্টের কারণ হবো? তোমার প্রার্থিত যশ তোমাকেই ভূষিত করুক!'

এই বলে নিমাই নিরহঙ্কার হয়ে তালপাতার পুঁথিটিকে ছিঁড়ে গঙ্গার সোঁতার মধ্যে ফেলে দিলেন। রঘুনাথ পরিতৃপ্ত যতখানি তার চেয়েও বিস্মিত, হতবাক্। অবাক্ হয়ে দেখলেন নিমাইয়েব সমস্ত দেহ থেকে যেন কারুণ্য গলে পড়ছে।

বাসুদেবের টোলে পড়াও ঐদিন শেষ করলেন তিনি। এই আখ্যান কতোখানি সত্য জানি না। কিন্তু এ কথা আমরা জানি কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য—কেউই কিছু লিখে রেখে যান নি।

১০

নিমাই এখন পণ্ডিত, নিমাই এখন অধ্যাপক, নিমাই এখন গৃহস্থ যুবকও বটে। জগন্নাথ মিশ্র অকালে চলে গেছেন, অকালে গৃহত্যাগ কবেছেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ। অধ্যাপনা করে খুব যে একটা আয় হয় এমন

মনে করার কারণ নেই। সম্ভবত শচীদেবী পরামর্শ দিলেন একবার বঙ্গ-দেশ বা পূর্ববঙ্গে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু আছে তার একটা ব্যবস্থা করে আসার জন্যে। হয়তো তাঁর নিজেরও ইচ্ছে হয়েছিল পিতৃ-ভূমি দর্শনেরও। এমন ইচ্ছে হওয়াটা অবশ্যই অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ্মী-প্রিয়াকে ডেকে বললেন—আমি মায়ের অনুমতি নিয়ে কিছুদিন বঙ্গ-দেশে যেতে চাইছি, তুমি মাকে এ-সময়ে ভালো করে দেখো, মায়ের সেবাযত্ন করো।

এই বলে কিছু শিষ্য সঙ্গে নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের দিকে রওনা হলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর ভ্রমণসূচীর বিস্তারিত জানা যায় না। বৃন্দা-বন দাস লিখেছেন—ধীরে ধীরে তিনি পদ্মানদীর ধারে এসে পৌঁছ-লেন। পদ্মার ঢেউ—সে অতি মনোহর, তার তীরে তীরে সুন্দর উপ-বন। নিমাইয়ের শৈশবের কথা মনে পড়ল। শিষ্যদের নিয়ে পদ্মার জলে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান-সাঁতার কাটলেন। পদ্মার সৌন্দর্য তাঁকে এমন করে আকর্ষণ করল যে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে পদ্মাতীরে থেকে গেলেন।

পূর্ববঙ্গেও ধীরে ধীরে অধ্যাপক নিমাইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পণ্ডিতেরা অনেকেই তাঁর কাছে এসে উপহার দ্রব্য সমেত আলাপ করতে লাগলেন। ঐ অঞ্চলের পণ্ডিত-অধ্যাপকেরা তরুণ নিমাইকে বললেন—

উদ্দেশ্যে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
যেই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥

—হে দ্বিজমণি, আমরা আপনার টীকা-টিপ্পনি যেন শুনতে পাই, এবং পড়াবার মতো বিদ্যা অর্জন করি। ছাত্ররা অর্থ-বৃত্তি নিয়ে নবদ্বীপে যায়, আজ আপনি নিজে এসেছেন, সে আমাদের কতো বড়ো সৌভাগ্য। আপনি আমাদের শিষ্য হবার সুযোগ দিন।

সেইমতো বহু ছাত্র হল তাঁর। অল্পদিনেই তাঁরা বিদ্যার্জন করে সফল হলেন। এমনকি বহু ছাত্র ফিরে আসার সময় তাঁর সঙ্গে নব-দ্বীপ পর্যন্ত এলেন।

এখানে থেকে, কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি স্বভূমি শ্রীহট্টেও যান। এ-বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত প্রমাণ নেই। তবে পূর্ববঙ্গে গিয়ে তাঁর বেশ কিছু অর্থলাভ হয়েছিল। তপন মিশ্র নামক এক কৃষ্ণভক্তকে তিনি ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এই তপন মিশ্রই নিমাইয়ের প্রথম অনুশিষ্ট ভক্ত। কানে মন্ত্র দিয়ে যে শিষ্য গ্রহণ—তা নিমাই কোনোদিন করেন নি। সেই দিক থেকে তাঁর কোনো মন্ত্রশিষ্য ছিল না। এটাও বুঝবার মতো, গ্রহণ করবার মতো একটি ঘটনা। একজন ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী —তিনি গুরু হবার এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন নি···এটা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১১

পূর্ববঙ্গ বিজয় করে ফিরে এসে নিমাই হাসিমুখে টাকাকড়ি মায়ের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম জানালেন। কিছু আর্থিক লাভ হলেও নিমাইয়ের যে একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেছে, তার খবর এখনও তিনি পান নি। সন্ধ্যেবেলায় ফিরেছেন। মাকে প্রণাম জানিয়ে তখনই চলে গেলেন গঙ্গাস্নানে শিষ্যদের নিয়ে। শচীমা গেলেন পাক-শালায়. এতোদিন পরে ছেলে ফিরেছে। কিন্তু মন বিষণ্ণ, গভীর বিষাদে ভরা। ছেলেকে কি করে বলবেন এই বিরাট ক্ষতির কথা। আত্মীয়-স্বজনও মুহ্যমান।

অনেকদিন পরে গঙ্গায় এসেছেন নিমাই। বড়ো আনন্দ মনে আজ তার। সশিষ্য অনেকক্ষণ ধরে জাহ্নবীতে স্নান সেরে বাড়ি ফিরলেন নিমাই। নিত্যকর্ম, আহার সেরে বসলেন বিষ্ণু মন্দিরের দরজায়। তাঁকে ঘিরে বসেছেন আত্মীয়স্বজন। তাঁরা কেউ গম্ভীর, কেউ বিষণ্ণ। নিমাই কিছুই বুঝতে পারেননি, আঁচও করেননি কোনো ক্ষতির। তাই সকলের সঙ্গেই তাঁর স্বভাবসুলভ রঙ্গে পরিহাসে মত্ত হলেন তিনি। কিভাবে বঙ্গদেশে তাঁর দিন কেটেছে তার রসময় বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। আরও একটা বড়ো রঙ্গ ছিল তাঁর পূর্ববঙ্গীয় ‘বাঙাল’ কথায় কথা বলা।

কেউ কিন্তু নিমাইকে তাঁর ক্ষতির কথা বললেন না—নিমাই কষ্ট

পাবেন বলেই হয়তো তাঁরা কোনো কথা আগ বাড়িয়ে বললেন না ; সবই তো তিনি জানতে পারবেন এখনই ।

রাত হয়েছে দেখে আত্মীয়েরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন । তখনও নিমাইয়ের রঙ্গ থামেনি। রসিক নিমাই কেন বুঝতে পারছেন না যে এতো জমাট আসরে কেন শচীমা একবারও এসে বসছেন না, বসে পুত্রের ভ্রমণ কাহিনী শুনছেন না । এক গভীর দুঃখে দুঃখিত শচী ঘরের মধ্যেই চুপ করে বসে রইলেন। আর কেন প্রবাস-আগত স্বামীকে দেখার জন্যে লক্ষ্মীদেবী একবারও স্বামীর কাছে এলেন না ? নাকি সে লজ্জায় ! না, আর কিছু ঘটেছে ?

সকলে চলে যেতেই খেয়াল হল নিমাইয়ের, তাই তো মা নেই কেন এখানে ? আস্তে-ব্যস্তে ঘরে গিয়ে দেখেন মা চুপ করে বসে আছেন—গোটা মুখে তাঁর বিষাদের ঘনঘটা ।

একটা অজানা আশঙ্কায় নিমাই যেন দুলে উঠলেন । খুব মৃদুভাবে আর খুব মিষ্টি সুরে মাকে জিগ্যেস করলেন—মা কী হয়েছে তোমার ? এমন চুপ করে আছ কেন তুমি ? আমার উপর রাগ হয়েছে তোমার ? আমি কি কোনো দোষ করেছি ? আমি কোন্ দূর দেশ থেকে তোমার কাছটিতে এলাম। আর তুমি এমন দূরে দূরে রইলে, কোনো খবরাখবর পর্যন্ত নিলে না ? তোমার কি হয়েছে, মাগো বল না, কিছু লুকিয়ো না আমার কাছে ।

শচী দেবী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না । একেবারে হুহু করে কেঁদে উঠলেন । তারপর বলে উঠলেন—তোর লক্ষ্মী নেই । আমার লক্ষ্মী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের জন্যে ।

কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হয়ে গেলেন গৌরচন্দ্র ।

লক্ষ্মীপ্রিয়া । এতো অল্পদিনেই তাঁদের যুগ্মজীবন শেষ হয়ে গেল ! তবে কি লক্ষ্মী আমি চলে গেলে সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে থাকত। সে কি নিজেই বেছে বেছে সাপের গর্তে পা দিয়েছিল ? কি অপরাধ সে করেছিল যার ফলে সাপের কামড়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল ?

একটু সামলে নিয়ে নিমাই মুখ নিচু করেই বলতে লাগলেন, মাগো

দুঃখ করো না। আমার মন বলছিল তোমার বউয়ের একটা অমঙ্গল হবেই। এই বলে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করেই বসে রইলেন।

তারপরে আবার সামলে নিয়ে সেই দার্শনিক উক্তিটি করে মাকে সান্ত্বনা দিলেন—দেখো মা, এ সংসারে কে কার পতি, কে কার পুত্র? ভাগবতে তো বলাই হয়েছে—কস্য কে পতি—পুত্রাত্মা মোহ এব হি কারণম্। কেউ কারোর নয়। আমরা যে ভেবে থাকি এ আমার পতি, এ আমার পুত্র—সে শুধু মোহের বশেই ভেবে থাকি।

তিনি আরও বললেন, মা গো তুমি দুঃখ করো না। কেন দুঃখ করবে মা? জানোই তো ভবিতব্যকে কেউ লঙ্ঘন, কেউ খণ্ডন করতে পারে না। জগৎসংসারের নিয়মই তো এই যে কেউ কারোর নয়, সকলেই স্বতন্ত্র। সংসার অনিত্য—বেদে তো এ কথাই বলা হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত জগৎ সংসার ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মাত্র পরিচালিত। অতএব তাঁর নির্দেশ মানাই উচিত—অকারণ কষ্ট পেয়ে কোনো লাভ নেই। আর তোমার বউমা সধবা অবস্থায় গঙ্গালাভ করেছেন—সে তো সব সীমন্তিনীর চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

এই বলে নিমাই গভীর সংযমে আত্মসংবরণ করলেন।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ সমাপ্ত হয়েছে। ঘরের একটি জাগতিক বন্ধন তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া নেই। শচীমা আপন মনে গৃহকর্ম করেন। ঘরের দিকে নিমাইয়ের মন আর তত টানে না। এখন তিনি তাঁর পূর্ণ সময় দিয়েছেন অধ্যাপনায়। তাতেই তাঁর পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ পরিতৃপ্তি। মনের মধ্যে দুঃখ কি আর জাগে না? কিন্তু নিরন্তর বিদ্যাচর্চায় সে দুঃখকে তিনি গোপন করে রাখেন। যে দুঃখ ব্যক্তিগত, সকলের কাছে তা প্রকাশ করাও অনুচিত ভেবে একেবারে চুপ করে থাকেন।

মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহের টোল আবার শিষ্য সমাগমে সরগরম হয়ে উঠেছে। দিবারাত্র নিমাই পণ্ডিত সেখানে অধ্যাপনা করে চলেছেন। ভোরে উঠে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিমাই পড়াতে বসাবার আগে মাকে প্রণাম করে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ির দিকে রওনা হন। চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসেন। একে একে শিষ্যেরা আসেন। কোনো শিষ্য তিলকহীন হয়ে

এলে তাঁকে মিষ্টি কথায় ত্রুটিসংশোধন করতে বলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে এসে তবেই পড়তে বসা উচিত—এমন শিক্ষা দেন। হয়তো শিক্ষাতে কিছুটা বিদ্রূপও মিশে থাকে কখনো কখনো।

নিমাই এই রহস্যপ্রবণতা একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি। সুযোগ পেলেই শিষ্য, সহপাঠী, আত্মীয়, গুরুজন—সকলকেই নানা রঙ্গরসে আক্রমণ করেন। কিন্তু একটি পরিবর্তন তাঁর জীবনে ঘটে গেছে। সেটি অবশ্য উল্লেখযোগ্য। জানি না লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুই তাঁকে পরিবর্তিত করেছিল কিনা। তবে পরিবর্তন একটা ঘটেই গিয়েছিল।

কিশোর নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের কথা আমরা বিস্তারিত বলেছি। দেখেছি তাঁর দুষ্টুমিপনা থেকে নবদ্বীপ-কিশোরী, নদীয়া-রমণীদেরও পরিত্রাণ ছিল না। কিন্তু এখন নিমাই স্ত্রীলোকের ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল। এমনিতে এতো রসিক, কিন্তু এখন আর স্ত্রীলোকদের নিয়ে এতোটুকু রহস্যালাপ করতে চান না। বরং স্ত্রীলোকদের দেখলেই একটু দূরে থাকতে চান। পরে যে তিনি 'বিরক্ত সন্ন্যাসী' হয়ে উঠে স্ত্রীসঙ্গ একেবারে পরিহার করেছিলেন—তার সূচনা হয়েছিল এ সময়েই—এমন অনুমান আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।

কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে রহস্যালাপে নিমাইয়ের বুঝি কোনো ক্লান্তি নেই। পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে যেন এই পরিহাসপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেছে।

বিশেষত শ্রীহট্টের লোক দেখলে নিমাই যেন রঙ্গ করার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠেন। শ্রীহট্টিয়া ঢঙে কথা বলে তাঁদের চটিয়ে দিয়ে দারুণ মজা পান তিনি।

অবশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥

শ্রীহট্টিরা রাগ করে বলেন—বটে বটে, আপনি কোন্ দেশী বলুন তো শুনি? আপনার নিজ বাড়ি তো শ্রীহট্টে আর আপনি নিজেকেই এমন করে ব্যঙ্গ করছেন?

তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়।
পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে শোন কর কোন যুক্তি ইথে হয়॥

তবুও নিমাই থামেন না। 'নানা মতে কদর্থেন সে দেশী বচনে।' স্বভাবতই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শ্রীহট্টিয়ারা নিমাইকে তর্জনগর্জন করে তেড়ে যান। তাঁর কোঁচা ধরে টান মারেন। বন্ধুরা এসে মধ্যস্থ মেনে কোনো প্রকারে 'কোন্দল' থামান। মাঝে মাঝে এমন হয় যে 'বাঙ্গাল' দেখলে নিমাইকেই আগে-ভাগে পালাতে হয়।

অধ্যাপনায় রঙ্গরসে নিমাইয়ের দিন ভালই কাটে। ছাত্রগণ খুশী তাঁর অধ্যাপনায়। বছর খানেকের মধ্যেই তাঁরা আশাতীত ফললাভ করেন। কিন্তু শচীমায়ের মনে কোনো আনন্দ নেই। নিমাই সর্বক্ষণ বাড়ির বাইরে। লক্ষ্মীপ্রতিমা বধূটি অকালে চলে গেছেন। প্রায়ই একটা আশঙ্কা শচীকে চিন্তিত করে তোলে। তবে কি নিমাই, তাঁর গোরাচাঁদ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হবে!

তাই মনে মনে স্থির করেন—আবার বিয়ে দিতে হবে তাঁর। নইলে তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখা যাবে না।

১২

সন্ধান করতে থাকেন শচীদেবী অধ্যাপক নিমাইয়ের উপযুক্ত আর একটি কন্যাকে। খোঁজ করতে করতে শুনলেন নবদ্বীপেই বাস করেন 'রাজপণ্ডিত' সনাতন—তাঁর একটি উপযুক্ত বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। সনাতন একইকালে বিদ্বান এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ও অবস্থাপন্ন মানুষ।

আর তাঁর কন্যাটি সুচরিতা, মূর্তিমতী লক্ষ্মী যেন। একদিন শচী স্বয়ং কন্যাটিকে দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এঁকেই তাঁর পুত্রের বিবাহযোগ্যা পাত্রী বলে নির্বাচন করলেন। এঁকে অবশ্য আগেও এই

গঙ্গার ঘাটে শচীদেবী অনেকবার দেখেছেন যখন সে বেশ ছোট মেয়েটি ছিল। আজ নতুন করে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে মেয়েটি নজরে ধরে গেল শচীমায়ের।

মনে মনে সিদ্ধান্ত করে নিয়ে একদিন ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন শচী। তিনি আসতেই শচীমা বললেন—বাবা একটা কাজ তোমাকে ক'রে দিতে হবে। তুমি একবার রাজপণ্ডিত সনাতনের কাছে যাবে। তাঁকে গিয়ে জিগ্যেস করবে—তাঁর কন্যাটির সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ইচ্ছুক কিনা।

খুশী হয়ে কাশীনাথ দুর্গাস্মরণ করে সনাতনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সনাতন তাঁকে দেখামাত্র সমাদরে বসতে আসন দিলেন। তারপরে সমাচার জিগ্যেস করলেন। কাশীনাথ বসলে পরে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন—পণ্ডিত মশাই কি কারণে এসেছেন জানতে বড় আগ্রহ হচ্ছে, এখন যদি দয়া করে বলেন।

কাশীনাথ বললেন—যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা বলি। কথাটি বলবার জন্যেই এসেছি। এখন ভেবে দেখুন আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন। বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে যদি আপনার কন্যাটি দান করেন তো খুবই ভালো হয়। আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্রই তিনি। হর-গৌরী আর কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মতোই তাঁদের মিলন সম্পূর্ণ হবে।

রাজপণ্ডিত সনাতন ব্রাহ্মণের প্রস্তাবটি শুনলেন এবং বললেন আপনি একটু বসুন, আমি একবার সকলের সঙ্গে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করে আসি। কন্যা তো আমার একার নয়। এই বলে তিনি বাড়ির ভিতরে গেলেন।

অন্দরে গিয়ে সনাতন সকলকে কাশীনাথের প্রস্তাব জানালেন। সব শুনে সবাই খুব খুশি হয়ে প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। বললেন—এ নিয়ে তো দ্বিমত থাকার কোনো কারণ নেই। এ তো খুব শুভ প্রস্তাব। শুভস্য শীঘ্রং এ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সনাতন কাশীনাথকে সকলের ইচ্ছা নিবেদন করলেন। বললেন—শচীদেবীকে গিয়ে বলবেন—আমি রাজী,

বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে কন্যাদানের ব্যাপারে আমি খুব রাজি। আমার বংশের সৌভাগ্য যে এমন একটি সম্বন্ধ আপনা-আপনি এসে হাজির হল। এখন মেয়ের ভাগ্য। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মা সুখী হোক, চির-সীমন্তিনী হোক।

কাশীনাথ ফিরে এসে শচীদেবীকে সবিস্তারে যা কথাবার্তা হয়েছিল নিবেদন করলেন। শচীদেবী খুব স্বস্তিলাভ করলেন। এবার নিমাইকে কিছুটা ঘরে পাওয়া যাবে। নিমাই বিয়ের কথা শুনে প্রবল আপত্তি জানালেন। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে শেষে সম্মতি দেন। ধীরে ধীরে বিয়ের খবর নিমাইয়ের শিষ্যবর্গের কানে গেল। তাঁরা দারুণ খুশী তাঁদের গুরুমা আসছেন জেনে। বুদ্ধিমন্ত খান এত খুশি যে তিনি সোজা এসে প্রস্তাব দিলেন—মা জননী, এই বিয়ের যা কিছু খরচ, সে সব আমার। আপনি এ নিয়ে একটুও ভাববেন না।

বুদ্ধিমন্ত আগেই প্রস্তাবটি দিয়েছেন এবং শচীমা অনুমোদন করে-ছেন শুনে মুকুন্দসঞ্জয়ের মনে মনে খুব ঈর্ষা হল বুদ্ধিমন্তের সৌভাগ্য। তিনি বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে বললেন—এটা কি ভালো হল বুদ্ধিমন্ত। তুমিই সব ভারটা একাই নিলে, আমার জন্যে একটুও রাখলে না ?

উত্তরে বুদ্ধিমন্ত খান বললেন—দেখো ভাইসব, এ বিয়ে তো কোনো প্রকারে নমো নমো করে সারলে হবে না। এ হচ্ছে আমাদের পণ্ডিত মশাইয়ের বিয়ে। এমন একটা ধুমধাম করতে হবে যেন কোনো রাজ-পুত্রের বিয়ে হচ্ছে।

বিয়ের দিন ঠিক হল। সবাই অধিবাসের লগ্ন পালন করে আনন্দ করতে লাগলেন। খাটানো হল বড় বড় সামিয়ানা আর চাঁদোয়া। প্রতি দরজার দুপাশে শোভা পেতে লাগলো ছোট ছোট কলাগাছ। দরজার উপরে শোভা পেতে লাগলো আমের পাতা আর মুকুলের মালা। কলাগাছের পাদমূলে শোভা পেতে লাগলো পূর্ণমঙ্গল ঘট। দীপ, ধান, খই প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্তূপাকার হল। সমস্ত আঙ্গিনা, বারান্দা, মেঝে জুড়ে আঁকা হল সুন্দর সুন্দর আলপনা। শচীমায়ের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপের সমস্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা নিমন্ত্রিত হলেন।

অধিবাসে উপস্থিত থাকার জন্য। বিকেলে অধিবাসের সময় সকলকে খেতে আসতেও বলা হলো। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ শুচিবস্ত্র পরিধান করে যোগ্য ব্যক্তিদের ভোজ্য আর বস্ত্রাদি দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। সকলে তাঁকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, প্রার্থনা করলেন তাঁর বিবাহিত জীবনে চিরসুখশান্তির জন্যে।

বিকেলে অধিবাসের সময় গৌরচন্দ্র সাজতে বসলেন। চন্দন দিয়ে তাঁর গৌবতনু চর্চিত হল। শুভ্র ললাটে গোলাপী চন্দন আঁকা হল অর্ধচন্দ্রাকারে। তার মধ্যস্থানটিতে শোভা পেতে লাগল সুগন্ধি তিলক। কণ্ঠে, মণিবন্ধে দোলানো হল সুগন্ধি মাল্য। সূক্ষ্ম হলুদ রঙের কাপড় ত্রিকচ্ছ দিয়ে পরলেন তিনি। হাতেধানদূর্বা বাঁধা হল—পরে দেওয়া হল স্বর্ণমঞ্জরী দর্পণ। সুবর্ণ কুণ্ডল আর নবরত্ন হারে ঐ অপরূপ দেহ আরও অনুপম হয়ে উঠল।

এক প্রহর বেলা থাকতে সকলে বললেন—এবার শুভযাত্রা শুরু করা যাক। আসুন সকলে বরানুগমন করি। প্রায় এক প্রহর ধরে নবদ্বীপের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গৌরচন্দ্রকে পাত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

বুদ্ধিমত খান আয়োজনের কোনো ত্রুটি রাখেন নি। একটি সুসজ্জিত দোলা এসে উপস্থিত হল। বাজনা বাজতে লাগল। বেদধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর হুলুধ্বনি হতে লাগল। চারদিকে সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা।

শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ করে এবং মান্যজনকে মানদান করে বিশিষ্ট বর গৌরবিশ্বম্ভর দোলায় চড়লেন। আবার মঙ্গলধ্বনিতে সারা নবদ্বীপের আকাশবাতাস যেন মুখরিত হয়ে উঠল।

বরযাত্রীদল শোভাযাত্রা করে প্রথমে গঙ্গাতীরে উপনীত হলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। ধরাতলে অজস্র আলোকসজ্জা। প্রায়ই শোভাযাত্রার সামনে ও মধ্যস্থলে আতসবাজির রঙীন আলো দেখা যেতে লাগল। রাজা বুদ্ধিমন্তের সেপাইসান্ত্রীরা দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে আগে আগে হেঁটে চলেছে। তাদের অনেকেরই হাতে উড়ছে

নানা রঙা পতাকা। মাঝখানে ভাঁড়েরা রঙ্গ করছে। বাদ্যবৃন্দের কতো রকমের বাজনা তালে তালে বাজছে। দুধরনের ঢাক—জয়ঢাক আর বীরঢাক, মৃদঙ্গ, করতাল, কাহাল, দগড়, শাঁখ, বাঁশী, পটহ, বরগো, শিঙ্গা মিলে এক মধুর ঐকতান তুলে যেতে লাগল।

গঙ্গাকে প্রণাম নিবেদন করে শোভাযাত্রা শহরে প্রবেশ কবল। দুপাশের বাড়ির জানলা দরজা খুলে যেতে লাগল। সবলেই ঘরের বাইরে। শোভাযাত্রার আড়ম্বর আর বিশ্বম্ভরের সাজসজ্জা দেখে সক-লের মুখেই এক কথা, এতোখানি বয়স হল বাপু, এমন ধূমধামটি আগে কখনো দেখিনি। কারও কারও মন যে খারাপ হয়নি তা নয়। আই-বুড়ো বিবাহযোগ্য মেয়ের অভিভাবকেরা ভাবতে লাগলেন—তাঁদেব মেয়ের এমন যোগা পাত্র জোটার বরাত কি হবে!

নবদ্বীপশহর পরিক্রমা করে শেষে শোভাযাত্রা রাজপণ্ডিত সনাতনেব বাড়িতে এসে হাজির হলো। কন্যাপক্ষ যথেষ্ট বিত্তবান্। তারাও বাজ-নার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাত্রপক্ষ আসতেই তাঁরাও বাদ্যকরদের বাজনা বাজাতে বললেন। এমনি দুপক্ষের বাজনার আওয়াজে যেন সারা শহর দুলতে লাগল।

স্বয়ং সনাতন এগিয়ে গিয়ে পাত্রের সম্মাননা করলেন। দোলায় থেকে তিনিই কোলে করে গৌরচন্দ্রকে নামালেন। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এমন মনোহর জামাই পেয়ে তিনি বড়ো আনন্দিত। খই আর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

ব্রাহ্মণদের বরণ করে জামাইবরণ শুরু হল। পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি নিয়ে তিনি জামাইবরণ করলেন। এয়োস্ত্রীগণ এসে স্ত্রী-আচার আরম্ভ করলেন। ধানদূর্বা, ঘিয়ের প্রদীপে আরতি হল। আর নিরন্তর হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হতে থাকল।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাজসজ্জা সমাপ্ত। নানা অলঙ্কারে তাঁকে সাজিয়ে নিয়ে আসা হল বিবাহ মণ্ডপে পিঁড়িতে বসিয়ে। বিশ্বম্ভরকেও একটি পিঁড়িতে বসিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করানো হল। এর পরে হল মালাবদল। তারপরে উভয়ের ফুল ফেলাফেলি খেলা। সবাই সানন্দে

রঙ্গ দেখতে লাগলেন। তারপর আনন্দ-বিবাদ উভয়পক্ষে। বিয়ের আসর উঠল দারুণ ভাবে জমে।

কন্যাসম্প্রদান সমাপ্ত হল। সনাতন জামাতাকে যৌতুক হিসেবে দিলেন গোরু, ভূমি, শয্যা, দাস ও দাসী। লক্ষ্য করার ব্যাপার নগদ টাকা বা ঐ ধরণের যৌতুক দেওয়া হয়নি। অন্ততঃ জীবনীতে তার উল্লেখ দেখি না। প্রথম বিবাহে অবশ্য পাঁচটি হরিতকী ছাড়া নিমাই আর কিছুই গ্রহণ করেন নি।

শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে হোম প্রভৃতি সংস্কার শেষ হলে বাসর ঘরে গেলেন উভয়ে। মহানন্দে রাত্রি অতিবাহিত হলো। পরের দিন সকালেও স্ত্রী-আচারাদি পালিত হলো। বিকেলের দিকে বাড়ি ফেরার পালা। মন্ত্রাদি পাঠ হল। দুপক্ষের বাজনাদাররা জেদাজেদি করে সানাই ঢাক বরগোঁ প্রভৃতি বাজাতে লাগলো।

গুরুজনদের প্রণাম করে বর-কনে এবার দোলায় উঠলেন। দেখে সবাই বলে উঠলেন আহা এ যেন হরগৌরী। কেউ বা বললেন— মানিয়েছে ঠিক যেন লক্ষ্মীনারায়ণ। সন্ধ্যে নাগাদ তাঁরা নিজের বাড়িতে এসে পেঁছুলেন। শচীমাতা এয়োস্ত্রীদের নিয়ে নববধূকে বরণ ক'রে ঘরে তুললেন। তাঁর দু চোখে জল—মনে পড়ছে তাঁর জগন্নাথের কথা, বিশ্বরূপের কথা আর লক্ষ্মীসমা লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথাও। আবার সেই জলে মিশেছে আনন্দের সুধাধারাও। নিমাই যে আবার সংসারী হবে, সংসারে মন দেবে।

আত্মীয়স্বজন, গুরুজনদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও সম্মান ও বিদায় জানালেন বিশ্বম্ভর। বুদ্ধিমন্ত খানকে আলিঙ্গন করলেন গভীর প্রেমে। লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিল তাঁর স্বনির্বাচিত বধূ। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁর সেই বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য-জীবন গভীর হল। নিমাইপণ্ডিত এখন সংসারীও হয়ে উঠলেন। শচী-মাতা সুখী হলেন।

১৩

আনুমানিক তেইশ বছর বয়সে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই গয়া গিয়ে পিতৃ পিণ্ডদানের সংকল্প করলেন। সেইমত কিছু বন্ধুবান্ধব ও বেশ কিছু শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে গয়ার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। যাবার আগে মায়ের কাছে গিয়ে অনুমতি চেয়ে নিলেন।

গঙ্গাতীর-পথে তিনি নানা দেশ নানা গ্রাম অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন। পথে যেতে যেতে ধর্মকথা ছাড়া নানা রসিকতাও চলতে লাগল। কলহর্গা-ভাগলপুর হয়ে এক সময়ে মন্দারে পৌঁছলেন। সেখানে মন্দার-মধুসূদনকে দেখে খুশীমতো মন্দার পর্বতে ঘুরে বেড়ালেন। ঘুরতে ঘুরতে পথিমধ্যে একদিন বিশ্বম্ভরের গায়ে বেশ জ্বর হলো। সঙ্গীরা চিন্তায় পড়লেন। বিশ্রাম নিয়ে জ্বরের চিকিৎসা করা হল। তারপর এগিয়ে চললেন তাঁরা পুণ্যতীর্থ গয়ার দিকে।

যাবার পথে বৈদ্যনাথধাম এবং বরাবর পার হলেন। গয়ায় পৌঁছে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে পিতৃদেবের পূজা সারলেন। চক্রবেড়ে গিয়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করলেন এবং ভগবদ্‌প্রেমে আকুল হলেন। এই প্রথম এতোখানি আকুলতা। একেবারে যেন প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন।

ঠিক এমনি সময়ে সেখানে দেখা পেলেন ঈশ্বরপুরীর। দ্বিতীয়বার দেখা। নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীকে দেখেছিলেন অনেকদিন আগে। ঈশ্বরপুরী গয়াতে এতোদিন পরেও বিশ্বম্ভরকে দেখে চিনতে পারলেন। নিমাই এগিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম জানালেন। ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রকে দেখে সানন্দে আলিঙ্গন করলেন। দুজনেই গভীর প্রেমে বিগলিত হয়ে গেলেন।

ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের ভক্তিভাব দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। ভাবলেন এই কি সেই উদ্ধত চপলমতি অধ্যাপক, কথায় কথায় যিনি কেবল তর্ক করতেন, অপরের দোষদর্শন করতেন আর ছিলেন ন্যায়-শিরোমণি?

বিশ্বম্ভর বললেন—আপনার চরণ দর্শন করে আমার গয়া আসা সার্থক হল। তীর্থে মানুষ পিণ্ড দেয় পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য। আপনাকে দর্শন করলেও মানুষ উদ্ধার পায়। আপনিই তীর্থের পরম মঙ্গল-প্রধান। আপনি আমায় এই সংসার-পারাবার থেকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার কাছেই দেহ-মন সমর্পণ করলাম। আপনি আমাকে পরিবর্তে ঈশ্বরপ্রেম দান করুন।

ঈশ্বরপুরী মধুরস্বরে বললেন—আমিও তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে শুভ-স্বপ্নের ফল পেলাম। তোমাকে দেখে থেকেই সারা শরীরে পরমানন্দ ভোগ করছি। তোমাকে দেখে থেকেই আমার মন তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তুমি একজন ভক্ত। তোমাকে দেখলে আমি কৃষ্ণদর্শ-নের সুখ পাই।

এরপর বিশ্বম্ভর ফল্গুতীর্থে গিয়ে বালুকার পিণ্ড দান করলেন। তার-পরে পাহাড়ের উপরে প্রেত-গয়ায় গেলেন। সেখানে শ্রাদ্ধ করলেন। পরে পরে শ্রীরাম-গয়া ও যুধিষ্ঠির-গয়ায় গেলেন। আরও নানা গয়ায় গিয়ে শেষে যোড়শ গয়ায় ষোড়শী করে শ্রদ্ধাভরে পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিলেন।

ফিরে এসে পাক করতে বসলেন। ঠিক এমনি সময়ে ঈশ্বরপুরী আবার এলেন। নিজের পাক করা অন্ন ঈশ্বরপুরীকে ধরে দিয়ে গৌর রায়ের বড়ো আনন্দ হল। আবার করে নিজের রান্না করে খেলেন। উভয়ের আজ বড়ো প্রেম, বড়ো আনন্দ। ধীরে ধীরে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেলো।

একদিন নির্জনে গৌরবিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীর বাড়িতে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরপুরী বললেন—মন্ত্র তো সামান্য ব্যাপার, তোমাকে আমার প্রাণ দিতেও আমি সদাপ্রস্তুত।

এই বলে তিনি দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে বিশ্বম্ভরকে দীক্ষা দিলেন। মন্ত্রের কোনো শক্তি আছে কিনা জানি না ; কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের আগেই নিমাইয়ের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেম গোপনভাবে স্ফূর্তিলাভ করছিল তা যেন প্রকাশ্যে সহস্রধারে বিগলিত হয়ে প্রকাশিত হল। নিমাই নিরন্তর কৃষ্ণ-

প্রেমে মত্ত হয়ে গেলেন। তাঁর নবজীবন লাভ হল। যে রহস্যপ্রিয়তা, চপলতা, বাকচাতুর্য, প্রগল্‌ভতা এবং অহংকারমত্ততা এতোদিন নিমাই-য়ের ভূষণ ছিল তা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে কখনো তিনি হাসছেন কখনও বা চিৎকার করে কাঁদছেন। হা-কৃষ্ণ বলে কাঁদেন আর গড়াগড়ি দেন। বাইরের জ্ঞান যেন হারিয়ে গেলো তাঁর।

ভক্তরা বিশ্বম্ভরের এই অবস্থা দেখে কোনো প্রকারে তাঁকে শান্ত করলেন। বিশ্বম্ভর চেতনা পেয়ে বলেন—আর আমি সংসারের বন্ধনের মধ্যে ফিরে যাবো না। তোমরা সবাই নবদ্বীপে ফিরে যাও। আমি এখন মথুরায় যাবো, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করবো।

ঈশ্বরপুরীর আগ্রহে নিমাই বেশ কিছুদিন গয়ায় থেকে গেলেন। একদিন সত্যিই তিনি ভাবাবেগে মথুরার দিকে যেতে লাগলেন। হঠাৎ ভিতর থেকে যেন শুনতে পেলেন—কে যেন তাঁকে বারণ করছেন—এখন যেও না, সময় হলে তো যাবেই। এখন নিজের বাড়ি যাও। শুনে নিমাই পথ থেকে ফিরে এলেন।

আর ক'দিনের মধ্যেই রওনা হলেন নবদ্বীপ অভিমুখে। সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে ফিরে এলেন। নবদ্বীপবাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য কর-লেন—নিমাইয়ের এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন! বয়োজ্যেষ্ঠরা নম্র, মৃদুভাষী শান্ত ভক্ত তরুণটিকে দেখে সানন্দে আশীর্বাদ জানালেন। নিমাইও সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করতে লাগলেন।

১৪

পণ্ডিত নিমাই, ভক্ত নিমাই হয়ে ফিরে এলেন গয়া থেকে। বঙ্গ-দেশে এর মধ্যেই এক বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী গোপনে ভজন-পূজন আরম্ভ করেছিলেন। নিমাই এবারে ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচারিত হল যে, গয়া থেকে ফেরার পর নিমাই ভগবদ্ভক্ত হয়ে গেছেন। একথা শোনার পর একে একে সকলে তাঁকে দেখতে এলেন। রাজপণ্ডিত সনাতন ও তাঁর পরিবার খুশি হলেন এবং খুশি

হলেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াও—'পতি-সুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল।'

সকলে বিদায় নিলেন। কেবল গুটিকয় বিষ্ণুভক্ত থেকে গেলেন। তাঁদের নির্জনে নিয়ে গিয়ে গয়াযাত্রার অভিজ্ঞতা সবিশেষ শোনালেন এবং বললেন—

"বন্ধু সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলো তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা' সভা সহিত নির্জন এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥

'কালি সভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে' তোমরা সবাই যাবে। আমার কথা আমি বলবো। শ্রীমান পণ্ডিত বিকেলে গেলেন সম্ভাষণ জানাতে। তাঁকে নিমাই একথা বললেন। শ্রীমানের মুখে একথা শুনে সমস্ত ভক্ত-গণ খুব আনন্দ পেলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গঙ্গাতীরের বাড়িতে একে একে হাজির হলেন সদাশিব, শ্রীমান, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ। গদাধরও এসে 'থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া।'

এ হেন সময়ে নিমাই এসে উপস্থিত এবং কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হয়ে চেতন-অচেতন অবস্থার মধ্যে চলতে লাগলেন। ভক্তগণ চমৎকৃত। শেষে প্রশ্ন করলেন 'কোন জন গৃহের ভিতর?' শুনে গদাধর বের হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে নিমাই বললেন,—গদাধর তুমিই পুণ্যবান, ছোট থেকেই কৃষ্ণনাম করে গেছো। আমি বৃথা সময় নষ্ট করেছি। এই বলে পুনর্বার কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদপ্রায় হলেন।

শেষে বাহ্যজ্ঞান পেয়ে শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে দেখা করতে চললেন। গুরু শিষ্যকে পেয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—তুমি ধন্য, তোমার পড়ুয়ারা তোমাকে ছাড়া কিছু জানে না। এখন তুমি এসেছ—কাল থেকে আবার তাদের পড়াতে আরম্ভ কর।

গুরু প্রণাম সেরে এবার তিনি গেলেন তাঁর চতুষ্পাঠী যেখানে, সেই মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ি গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর বসলেন। নিমাই এসে-ছেন, তিনি ও সেখানের সকলে খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু নিমাইয়ের

আচরণ সকলকে বিস্মিত করল। এমনকি শচী দেবী পর্যন্ত বিহ্বল। তিনি গঙ্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা করেন আর প্রার্থনা করেন—

স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥

বিষ্ণুপ্রিয়াকে এনে ছেলের পাশে বসান; কিন্তু নিমাই যেন দেখেও দেখতে পান না।

গঙ্গাদাস টোল খুলে পড়াতে বলেছেন—সকালে পড়ুয়ার দল দল-বেঁধে আসে। কিন্তু পড়াবেন কি নিমাই। তাঁর যে তখন সব কৃষ্ণময়। ছেলেরা যা প্রশ্ন করে—নিমাই সব কিছুরই উত্তর কৃষ্ণপ্রসঙ্গে নিবেদন করেন। বলেন সব ছেড়ে দাও—

শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥

পড়ুয়ারা অবাক্। পড়ার কিছু বোঝে না তারা। তখন নিমাই পুঁথি বাঁধতে বলে সকলকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গায় গিয়ে বিশ্বম্ভর সেই আগেকার নিমাই। এপার-ওপার গঙ্গায় নিমাই মাতোয়ারা।

বাড়ি ফিরে এসে নিমাই খেতে বসলেন। মা খাবারের থালা এগিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন—

'আজি বাপ! কি পুথি পঢ়িলা?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?'

নিমাই বললেন—'আজি পঢ়িলাঙ কৃষ্ণনাম'—আজ আমি শুধু কৃষ্ণনাম পড়েছি। এই বলে মাকে কৃষ্ণভক্তির কথা সবিস্তারে জানালেন।

পরের দিন সকাল হতেই পড়ুয়ার দল আবার এসে হাজির। তারা গুরুকে 'সিদ্ধবর্ণ সামাম্নায়?' বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। নিমাই উত্তর কর-

লেন 'সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ'। শিষ্যরা বলেন 'পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর'। গৌর সব কথাতেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আনেন। ছেলেরা বুঝতে পারে না। নিমাই বলেন, ঠিক আছে এখন যদি না বুঝতে পার তবে বিকেলে সব ভাল মনে বুঝিয়ে দেবো। শিষ্যেরা সকৌতুকে পুঁথিপাতড়া বেঁধে নিলেন। তাঁদের গুরুর এ কী হলো? এ যে দেখছি প্রবল বায়ুরোগের প্রকাশ। পুঁথি নিয়ে তারা সবাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়ে অনুযোগ করে বলল—আপনি পণ্ডিতকে একটু বুঝিয়ে বলুন! সব প্রশ্নেরই উত্তর যদি 'কৃষ্ণ' হয়, তবে আমাদের শেখার কি আছে?

গঙ্গাদাস বললেন—ঠিক আছে। এখন সবাই বাড়ি যাও। বিকেলে সবাই বিশ্বম্ভরকে নিয়ে তাঁর কাছে যেতেই গঙ্গাদাস বললেন—দেখ বাবা বিশ্বম্ভর, ব্রাহ্মণই ভাগ্যক্রমে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুযোগ পায়। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা তো কেউ মূর্খ নন—অথচ কেউ কি অভক্ত? তুমিও পণ্ডিত অধ্যয়ন না ছাড়লে কি ভক্তিভাব রাখা যায় না? যাও 'ভাল মতে গিয় শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও'।

হঠাৎ যেন ভক্ত নিমাই আগেকার পণ্ডিত নিমাই হয়ে গেলেন সেই দাম্ভিক, সেই তার্কিক। বললেন—ঠিকই বলেছেন। আমি পড়াবো। আমার ব্যাখ্যানে ভুল ধরে নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত নেই শুনে গঙ্গাদাস খুশী। তিনি তো তা-ই চেয়েছিলেন।

নিমাই পড়াতে শুরু করলেন। সেই পণ্ডিত নিমাইকে আবার করে শিষ্যেরা প্রত্যক্ষ করল। রাত্রি চারদণ্ড পার হয়ে গেছে, তবুও বিশ্বম্ভর আবিষ্ট হয়ে ব্যাখ্যান করেই চলেছেন।

এহেন সময়ে একটা বিপত্তি ঘটে গেল। পিতৃবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য পাশের একটি ঘরে বসে ভাগবত পাঠ করছিলেন। হঠাৎ সেই শ্লোক বিশ্বম্ভরের কানে প্রবেশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল নিমাইয়ের মধ্যে সেই 'অতিবাঞ্ছিত পরিবর্তন। 'বোল' 'বোল' ব'লে তিনি নিরন্তর বলতে থাকলেন এবং ছুটে গিয়ে রত্নগর্ভকে জড়িয়ে ধরলেন। গদাধর রত্নগর্ভকে বললেন—তুমি আর শ্লোক প'ড়ো না। এই বলে কোনো প্রকারে বিশ্বম্ভরকে শান্ত করলেন, তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন।

পুনরায় পরদিন পড়ুয়ারা পড়তে এলো এবং সেই একই অবস্থা—সব প্রশ্নের উত্তরই কৃষ্ণপ্রসঙ্গে আসে। ধাতুসূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন 'ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার'। তাঁর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পড়ুয়ারা বিস্মিত হয়ে শুনল। তবে বলতে বাধ্য হল 'সবে যে উদ্দেশ্যে' পড়াশুনো করতে এসেছে, এ সব উত্তরে তার কোনো ফললাভ হচ্ছে না। নিমাই স্বীকার করলেন—ঠিকই বলেছ তোমরা। আমিও সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কৃষ্ণছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না; কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কথা আমার মুখেও আসছে না। তোমাদের সত্যি বলছি, আজ থেকে আমার আর তোমাদের পড়াবার সাধ্য নেই। যার কাছে তোমাদের মন চায়, তোমরা পড়—আমি তোমাদের সাহস দিচ্ছি।

শিষ্যেরা প্রণাম নিবেদন করে বললেন—এই কথা। তোমার কাছে পড়ার পর অন্যের কাছে পড়বো ? যা পড়েছি এতোকাল, তা সব আমাদের হৃদয়ে থাক। এই বলে সব পুঁথিপত্তর বেঁধে ফেললেন—'পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর।'

তখন নিমাই হৃষ্টচিত্তে এক অভিনব প্রস্তাব দিলেন। এতোকাল পড়লাম শুনলাম। এবারে 'কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।'

শিষ্যেরা বললেন—কীর্তন, সঙ্কীর্তন—সে কেমন জিনিস ? সে কেমন করে করতে হয় ?

শুনে নিমাই নিজে সকলকে কীর্তন কেমন জিনিস তা গেয়ে শোনালেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

গাইতে গাইতে নিমাই করতালি দিতে লাগলেন, তাঁর চারিদিক ঘিরে ঘিরে শিষ্যেরা হাততালি দিয়ে সেই গান গাইতে লাগলো। সেই প্রথম নদীয়ায় কীর্তনের প্রচার হল। নিমাই হলেন সংকীর্তনের আদি পিতা।

নিমাই বঙ্গদেশ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি ভক্তি-অনুশীলনের প্রধান স্থান হয়ে দাঁড়ায়। অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণ সেখানে এসে মিলিত হতেন। আসতে শুরু করেছেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস ঠাকুরের মতো ভক্তগণ। এঁরা এতোদিন 'পাষণ্ডী'দের ভয়ে প্রকটিত হতে পারেন নি। এবার নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে এসে সংকীর্তনে মেতে উঠলেন।

খুব সহজে সব কিছু চলতে আরম্ভ করেছিল, এমন ভাবার কারণ নেই। কারণ এমনিতেই এই কৃষ্ণভক্তদের সম্পর্কে একদল নদেবাসী নানা কারণে ক্রুদ্ধ হয়েই ছিলেন। তাঁদের সেই রোষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় শাসনর্কতাও।

শ্রীবাসের ঘরে বৈষ্ণবেরা এসে সংকীর্তন করেন। ভক্তিশূন্য পণ্ডি-তেরা ভাবলেন এ কী বিষম বিপদ। নিমাইয়ের বিনয়, তাঁর দীনতা তাদের অসহ্য ঠেকতে লাগলো। এই সব 'পাষণ্ডীর' কথা শুনে নিমাই দারুণ রেগে যান। 'সংহারিব সব' বলে তিনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। তাঁর সংহার মূর্তি দেখে শচী ভয় পান, তুঃখও পান নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে। অন্যেরা ভাবেন বুঝি বায়ুরোগে ধরেছে নিমাইকে। নানা-জনে নানা ওষুধ বাতলায়। কেউ বলে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ, কেউ বলে ডাব-নারকেলের জল খাওয়াও, কেউ বা বলে 'শিবাঘৃত' মাথায় মাখাও। আসল রহস্য কেউ বোঝে না।

যাঁরা বুঝলেন তাঁরা ঐ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রমুখ ভক্ত-গণ। তাঁরা বিরোধীদের কারণে দরজা বন্ধ করেও কীর্তন করতে লাগলেন।

অদ্বৈত আচার্যকে বলা হয়, তিনি নিমাই-এর আবির্ভাবের জন্য প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের সময় হুঙ্কার দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকতেন। তাঁর কথা এখন কিছু বলা যাক। অদ্বৈত নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো

ছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বছরের তফাৎ উভয়ের বয়সের (জন্ম ১৪৩৫ খ্রীঃ)। কুবের তর্কপঞ্চানন ও লাভাদেবীর সন্তান অদ্বৈতও শ্রীহট্টের মানুষ, লাউড় পরগণার নবগ্রামে তাঁর জন্ম। আসল নাম কমলাক্ষ মিশ্র। বারো বছর বয়সে শান্তিপুরে আসেন। এক সময়ে তীর্থ ভ্রমণকালে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে দীক্ষাও নেন। হরিদাসের সঙ্গেও তাঁর গভীর সৌহার্দ্য জন্মে।

ভক্ত অদ্বৈত প্রায়ই বৈষ্ণবদের আশ্রয় দিয়ে বলতেন—কৃষ্ণ আগমনের সময় হয়েছে—'করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়নগোচর'। নিমাইও পরে একসময় বলেছিলেন—'ভারতবরষে নাহি আচার্য সমান।'

অদ্বৈত শিশু নিমাইকে দেখে থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গয়া থেকে ফিরে নিমাই খুব বিনয়ী হয়েছেন। এ-সংবাদে অদ্বৈত বলেছিলেন 'বড় সুখী হইলাম এ-কথা শুনিয়া।' শ্রীমান পণ্ডিত যখন বলেছিলেন 'পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব। নিমাই পণ্ডিত হলো পরম বৈষ্ণব।' তখন অদ্বৈতেরও সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু নিজে চোখে দেখে বিশ্বাস হল। বললেন—বিশ্বম্ভর, তুমি আমার কাছে সবার চেয়ে বড়ো। তবুও নিমাইকে পরীক্ষা করার জন্য হঠাৎ নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান শান্তিপুরে।

ইতোমধ্যে নিত্যানন্দ এসে মিলিত হলেন নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে। নিমাই তখন অদ্বৈতকে আনাবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন। অদ্বৈত এলেন এবং সকলে মিলে সঙ্কীর্তনে মত্ত হলেন।

অদ্বৈত মূলত জ্ঞানবাদী ছিলেন। ভক্তিবাদী ছিলেন না। নিমাইয়ের প্রভাবে তা হলেন। প্রভাব নয়, বয়সে বড় হলেও তাঁকে জ্ঞানবাদী করতে নিমাই শারীরিক অত্যাচার পর্যন্ত করলেন। জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়,—এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈত যেই বললেন—জ্ঞান বড়। অমনি—

পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
সহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥

পণ্ডিতভক্ত রহস্য বুঝতে পারলেন। তারপর থেকেই উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে বাঁধা পড়ে গেলেন।

নিত্যানন্দ এসে পড়েছেন এ সময়ে। বৃন্দাবন থেকেই তিনি নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশের কথা শুনে এসেছিলেন। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি এলেন নবদ্বীপে এবং নন্দন আচার্যের ঘরে এসে উঠলেন। তখন নিত্যানন্দের বয়স ৩১ বছর। নিমাইয়ের বয়স ২৩। উভয়ের মিলন ঘটল ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

নিত্যানন্দের জন্ম হয় ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে। পিতা হাড়ো ওঝাই বা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। তাঁর বাল্যকালে এক সুন্দর সন্ন্যাসী এসে পিতার কাছ থেকে তাঁকে ভিক্ষে করে নিয়ে যান। তখন থেকেই নিত্যানন্দ ভ্রমণকারী। তখন অবশ্য তাঁর নাম ছিল কুবের। বারো বছর বয়সে তীর্থ পর্যটন করতে বের হয়েছিলেন, ফিরে এলেন দেশে ২০ বছর পরে বহুদর্শী এবং বহু ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে। টোলে না পড়েও তিনি অভিজ্ঞতায় পণ্ডিত। সমগ্রভারত তিনি ভ্রমণ করেছেন, সম্ভবত এমন কোনো ভারতীয় তীর্থ নেই, যা তিনি পরিক্রমা করেন নি—বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, চক্রতীর্থ, নৈমিষ অরণ্য, অযোধ্যা, গোমতী, হরিদ্বার, পম্পা, শ্রীপর্বত, দাক্ষিণাত্যে বেঙ্কটনাথ, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, তাম্রপর্ণী ; পরে আবার কন্যানগর, অনন্তপুর, কেরল, মাহিষ্মতীপুরী প্রভৃতি স্থান। বনে বেড়াতে বেড়াতে দেখা হল মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে।

মাধবেন্দ্রকে ছেড়ে গেলেন 'সরযূ দেখিবারে'। পরে এলেন সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, মায়াপুরী, অবন্তী, জিওড় নৃসিংহ, কূর্মনাথ। পরে পুরী নিমাইয়ের অনেক আগেই। পুরী থেকে গঙ্গাসাগর। সেখান থেকে ফিরে আবার মথুরা ও বৃন্দাবনে। এই বৃন্দাবন থেকেই এলেন নবদ্বীপে।

নিত্যানন্দ এসেছেন শুনে নিমাই যবন হরিদাস আর শ্রীবাস পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন আচার্যের ঘরে গিয়ে 'কোটি সূর্যসম' নিত্যানন্দকে দেখে পরস্পরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। প্রথম সাক্ষাতে দুজনেই

স্তব্ধ। ঠিক হল নিত্যানন্দ এবারে শ্রীবাসের বাড়িতে এসে থাকবেন। নিমাই যে নেতা হবেন এককালে তাঁর নির্দেশদানের শক্তি থেকে তা বোঝা যায়।

এর মধ্যে নিমাই অদ্বৈতকে শান্তিপুর থেকে আনাবার জন্যে রামাই পণ্ডিতকে পাঠিয়েছেন। তিনি এলেন, ভক্তমণ্ডলী ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। নিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাসকে দিয়েই নিমাই প্রথম প্রচার-যাত্রায় পাঠান আগষ্ট ১৫০৯-এ।

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ ও মুসলমান হরিদাস একত্রিত হয়ে ধর্মপ্রচারে গেলেন—সাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে এর চেয়ে বড়ো শিক্ষা, প্রায় পাঁচশো বছরের পুরানো এই সম্প্রদায়িক উদাহরণ আর কি হতে পারে?

নিত্যানন্দের সঙ্গে গিয়েছিলেন হরিদাসও। এমন উৎসর্গীকৃত মানুষ-টির কথা আলোচনা করতে গিয়ে পাষণ্ডী হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। কারণ লোকের কাছে যিনি শুধু যবন হরিদাস, মানবত্বসেবী মানুষের কাছে তিনি ঠাকুর হরিদাস।

বর্তমান খুলনা জেলার বূঢ়ন পরগণার সোনাই নদীর তীরবর্তী ভাটকলাগাছি গ্রামে আনুমানিক ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম। বাবার নাম মনোহর, মায়ের নাম উজ্জ্বলা বলা হয়েছে। সে দিক থেকে তাঁকে হিন্দুবংশজাত মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি নিজেকে সর্বদাই 'ম্লেচ্ছাধম' বলেছেন। তবে কি তিনি বা তাঁর পরিবার মুসলমান-সংস্পর্শে এসেছিলেন যার জন্যে এই দীনতা? বিশেষত তাঁর মুসলমানী নাম কোনো সূত্রেই জানতে পারা যায় না।

সে যাই হোক—১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বহুস্থান তিনিও ভ্রমণ করেন এবং শেষে শান্তিপুরে এসে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে পরি-

চিত হন এবং তাঁর কাছেই 'ব্যাকরণ সাহিত্যাদি' পড়েন। শ্রীমদ্ভ-ভাগবতও তিনি পড়েন। অদ্বৈতই তাঁর হরিদাস নাম দেন। যদি মুসলমানকে অদ্বৈত ভাগবত পড়িয়ে থাকেন এবং 'তিলক তুলসী-মালা' পরিয়ে থাকেন—তবে অদ্বৈতকেও পরম উদার মানুষ বলে সম্মান করতে হয়। হিন্দুর সংকীর্ণতা ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করতে দুজনেই কাজে লেগেছিলেন।

হরিদাস নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর সময় অবশ্য নব-দ্বীপেই ছিলেন। পরে ফুলিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এবং

হরিদাস করে গোঁফায় নাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন ॥

তাঁর সংকীর্তনে বিরক্ত হয়ে কাজী ঐ মুলুকের মালিকের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বলেন যবন হরিদাস মুসলমানের ছেলে হয়েও হিন্দুর মতো আচার আচরণ করছে, আপনি ওকে ডেকে পাঠিয়ে একটু সমঝে দিন। হরিদাসকে বন্দী করা হল। নির্যাতন করা হল অপরি-সীম। হরিদাস কিন্তু হাসিমুখেই ঘোষণা করেন—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর,
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুতে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

দারুণ অত্যাচার চলে। সুবেদারের হুকুমে রক্ষীরা সমস্ত বাজারে নিয়ে গিয়ে হরিদাসকে বেত মারে, গা কেটে রক্ত বের হয়। হরিদাস ভারতের দ্বিতীয় যীশু। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—'ঈশ্বর, এদের অজ্ঞান বলে ক্ষমা ক'রো। এরা জানে না কি অপরাধ এরা করছে। তুমি এদের ক্ষমা করে এদেরকে প্রেম ও ভক্তি দাও।' আর বলেন—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হল মৃত ভেবে। তিনি মরেন নি

দেখে মুলুকপতি পীরজ্ঞানে ভক্তিভরে হরিদাসকে দরবারে ফিরিয়ে আনেন।

যাইহোক্ একসময়ে হরিদাস, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তন চলছেই। হরিদাসকে নিমাইয়ের খুব প্রয়োজন—বিশেষত প্রচারের কাজে। এতে জাতি বিভেদ অপ্রয়োজনীয়। অথচ বহু বৈষ্ণবকে দেখেছি জাতি ভেদ করতে। অথচ নিমাই নিজেই বলেছেন—

'যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। কোটি কোটি জন্ম, সে পরম দুর্গতিতে থাকবে।

১৬

হরিদাস-নিত্যানন্দ তো নিমাইয়ের আদেশে 'কৃষ্ণনাম' প্রচার করতে বের হলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। স্বয়ং কাজী যে কতো অত্যাচারী তা তো হরিদাসের জীবনে লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া একদিন কাজী নিজে একজন হিন্দুর ঘরে ঢুকে তাঁর বাড়িতে কীর্তন বন্ধ করে দিলেন। খোল করতাল ভেঙ্গে দিয়ে তিনি সাবধান করে দিলেন—আজকের মতো তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু

আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥

নগরে ফতোয়া জারি করে দিলেন—কীর্তন বন্ধ। লোকে ভয় পেল। অনেকে নিমাইয়ের কাছে গিয়ে কাজীর অত্যাচার ও তাঁর ঘোষণার কথা জানালেন। বিশ্বম্ভর সব মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে তিনি মৃদুস্বরে অভয় দিয়ে বললেন—যাও, ভয় পেয়ো না, কৃষ্ণনাম কর। সঙ্কীর্তন কর। তবুও তাঁদের ভয় যায় না।

তখন কাজীর ঘোষণার প্রতিবাদে নিমাইও ঘোষণা করলেন : সে ঘোষণা ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা। সেই প্রথম গণঅভ্যুত্থানের ডাক।

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥

বিশ্বম্ভরের ঘোষণায় এক প্রবল ব্যক্তিত্ব ঘোষিত হল। লোকে যেন সংম্মোহিত হয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো, প্রবেশদ্বারে ঝুলতে লাগল আমের পল্লব। রক্ষিত হল কলাগাছের কাণ্ড। একটা চাপা উত্তেজনায় সমস্ত শহরের পরিবেশ নিথর হয়ে উঠল যেন।

চারটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনি সঙ্কীর্তন দলে বের হলেন। দল তিনটির নেতৃত্ব দিলেন যথাক্রমে হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস এবং নিমাই-নিতাই যুগ্মভাবে, সঙ্গে রইলেন গদাধর। কৌতূহলীরা একে একে জমতে লাগলেন, ভক্তেরা দলে এসে প্রবেশ করলেন। খোল-করতালের সঙ্গে হরিধ্বনি মিলিত হয়ে সমস্ত নগর কাঁপিয়ে তুলল। অসংখ্য ভক্তজন নিয়ে নবদ্বীপের পথ মুখরিত করে বিশাল জনঅরণ্য ক্রমে কাজীর ঘরের দিকে এগোতে লাগল। চাঁদ কাজী আগে ভাগে খবর পেয়েছিলেন। এতোখানি সঙ্ঘটিত জনমতের সংবাদে ভয়ও পেয়েছিলেন কিছুটা—
'কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।'

নিমাই তখন 'ভব্যলোক' পাঠিয়ে কাজীকে ডেকে পাঠলেন। কাজী মাথা নিচু করে এলেন। নিমাই তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে বললেন—'দেখ আমি হলাম গিয়ে তোমার অভ্যাগত, আর আমাকে দেখে তুমি লুকিয়ে রইলে, একি উচিত কাজ হল?' কাজী বললেন—দেখ তুমি দারুণ রেগেছ, তোমাকে শান্ত করতেই আমি লুকিয়ে ছিলাম। এখন তুমি শান্ত, তাই এলাম। তোমার মতো অতিথি আমি ভাগ্যগুণে পেলাম। তোমার দাদু নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার গ্রাম সম্বন্ধে 'চাচা', আর জানোই তো 'দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা' এবং 'সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা'। মামার দোষ কি ভাগনের দেখা উচিত?

এই বলে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তাঁর নানা কথা হল। বিশ্বম্ভর বললেন—

তুমি কাজী, হিন্দু ধর্মের বিরোধী হতেই পারো। কিন্তু সংকীর্তন করতে মানা করেছ কেন?

কাজী বললেন—এক পেয়াদা এসে আমাকে কীর্তন নিষেধ করতে বলেছিল বটে। তার কথা শুনে ব্যাপারটা যাচাই করার জন্যে হিন্দুর ঘরে লোক পাঠিয়েছিলাম। 'পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত'জন এসে আমাকে বলল 'হিন্দুর ধর্ম ভাঙিল নিমাই'। গয়া থেকে সে পাগল হয়ে এসেছে, লোককেও সঙ্কীর্তনে পাগল করে তুলেছে। রাতে ঘুম নেই।' তাদের কথা শুনেই বলেছি, তোমরা ঘরে যাও—'আমি নিষেধিব তারে' এই বলে কাজী ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। আর কথাও দিলেন—আর কেউ সঙ্কীর্তনে বাদ সাধবে না। এক মুসলমান অন্যধর্মচারী কাজী সহজেই নিমাইয়ের যুক্তিতে, ব্যক্তিত্বে ও প্রেমে পরাস্ত হয়ে গেলেন। নিমাই শুধু সঙ্কীর্তনের পিতা নন। ভারতে তিনি প্রথম গণঅভ্যুত্থান ঘটালেন। নিমাই তাই পরাধীন ভারতে প্রথম গণনায়ক। কেউ যদি একে ধর্মঘট বলেন—তার সূচনাও এখানেই। আর যদি কেউ একে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঘোষণা বলেন—অবশ্যই তা সীমিত অর্থে, তাও বলতে পারেন।

শুধু কাজী কেন, অন্য 'পাষণ্ডীরা'ও যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলেছিল। তারাও অত্যাচার করে যত নিমাইয়ের প্রচারও তত বেগবান হয়। এমনি এক প্রচারকালে নিত্যানন্দ-হরিদাস জগাই-মাধাই নামে দুই অত্যাচারীর কবলে পড়লেন। তাঁরা তো নিমাইয়ের আদেশে 'কৃষ্ণ নাম ভজনা'র উপদেশ প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এমন সময় জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। জগাই-মাধাই দুই ভাই, ব্রাহ্মণ তনয় কিন্তু এহেন কুকার্য নেই যা তারা করে না। মদ খেয়ে যে পথে যেতো সে পথে কেউ হাঁটতে পারতো না। নারীদের সম্ভ্রম নির্যাতিত হত।

নিতাই-হরিদাস তাঁদের দেখে নিমাইয়ের পরামর্শমতো তাদেরকে 'কৃষ্ণনাম' দিতে গেলেন। সকলে নিষেধ করলেন, বললেন 'নিকটে না যাও। নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও।' তাঁদের মধ্যে তখন

পাপী উদ্ধারের আবেগ কাজ করছে। মানা না শুনে কাছে যেতেই চোখ লাল করে 'ধর ধর' বলে তুই দস্যু তাঁদের পিছনে ধাওয়া করল। ভয় পেয়ে তুজনে ছুটতে লাগলেন। নিত্যানন্দ বলেন—'গোঁসাই আজ বুঝি প্রাণে মারা পড়ি।' হরিদাস বলেন 'তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল।' স্থূল শরীর নিয়ে তিনি চলতেও পারেন না। শেষে দস্যু তুজন মদের প্রকোপে পড়ে গেলে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

নিত্যানন্দ হরিদাস নিমাইকে গিয়ে সব কথা বললেন। গঙ্গাদাস, শ্রীনিবাসও তাঁদেরকে সমর্থন করলেন। শুনে নিমাই দারুণ রেগে গিয়ে বললেন—সে তুটো কোথায়। তাদেরকে পেলে আমি 'খণ্ড খণ্ড' করবো। নিত্যানন্দ বললেন—'তুমি খণ্ড খণ্ড করগে যাও, কিন্তু সে তুটো থাকতে আমি কোথাও যাবো না।'

এই সব কথা নিয়ে হরিদাস-অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। অদ্বৈত একবার দারুণ রেগে গেলেন নিমাইয়ের উপর। শেষ পর্যন্ত সবাই শান্ত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, ঐ তুই পাপীকে উদ্ধার করতে হবে।

কদিন পরে নিত্যানন্দ ভ্রমণ সেরে সন্ধ্যায় নিমাইয়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় ঐ তুই পাষণ্ড নিত্যানন্দকে দেখে বললেন 'কে রে কে রে'। নিত্যানন্দ বললেন—আমি অবধূত, নিমাইয়ের বাড়ি যাচ্ছি। অবধূত শুনেই মাধাই রেগে গিয়ে একটি ভাঙা কলসীর কানা তুলে নিত্যানন্দের দিকে ছুঁড়ে মারলো—

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥

নিত্যানন্দের মাথা কেটে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগল। নিমাইকে স্মরণ করে ক্ষমাশীল নিত্যানন্দ তাদেরকে কৃষ্ণনাম শোনাতে লাগলেন। শুনে মাধাই আবার রেগে গিয়ে মারতে গেল। তখন জগাইয়ের কেমন যেন মায়া হল। সে মাধাইয়ের হাত ধরে বলল—

এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥

অনেক লোক জমে গেছে ইতোমধ্যে। কেউ কেউ শশব্যস্তে নিমাইকে গিয়ে সব ঘটনা বললেন। অমনি ছুটে এসে তিনি 'চক্র চক্র' ডাকলেন। নিমাইয়ের রুদ্রমূর্তি দেখে দস্যু ছুটো ভয় পেয়ে গেল। নিতাই তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের হাত ধরে বললেন—মেরো না মেরো না নিমাই। আমার কোনো কষ্ট হয় নাই। দৈবক্রমে আমার রক্ত পড়েছে। শুনলে অবাক হ.ব যে 'মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।'

'জগাই'-এর দয়ার কথা শুনে নিমাই সুখী হলেন। তিনি জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন এবং বললেন—'কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।' পরে পরে নিত্যানন্দের পরামর্শে মাধাইকেও আলিঙ্গন দিলেন। মজার কথা তখনও মাধাই নিত্যানন্দকে মারবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জগাই পরিবর্তিত হয়েছে দেখে সে যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সে-ও করুণা আর ক্ষমা পেল। এখানে নিত্যানন্দের ক্ষমাশীল চরিত্র নিমাইয়ের চেয়েও অনেক মহৎ।

বাড়িতে গিয়ে নিমাই যখন কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন—সমগ্র নবদ্বীপবাসী সবিস্ময়ে দেখলেন—

'জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।'

কীর্তানান্তে সকলে মিলে সানন্দে গঙ্গাস্নান করে এলেন।

সব অনাচার ত্যাগ জগাই-মাধাই। তারা নিত্য গঙ্গাস্নান করে প্রতিদিন জপ করে দু'লক্ষ হরিনাম।

ভক্ত মাধাই নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে গঙ্গার তীরে স্নানার্থীদের জন্য ঘাট তৈরি করে দিলেন—নাম হল তার 'মাধাইয়ের ঘাট'।

জগাই মাধাইয়ের মতো দুই দস্যুর এই পরিবর্তনে স্বভাবতই নবদ্বীপ বাসীদের মন নিমাইয়ের দিকে আরও ফিরে গেল।

১৭

জগাই-মাধাই উদ্ধার, হরিদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নিমাই-বিরোধীও হয়ে উঠেছিলেন। নিত্যানন্দ এসে

জুটেছেন তাঁদের সঙ্গে। বৃন্দাবন দাস যা লিখেছেন তাতে দেখছি যে অদ্বৈত আচার্য বার বার নিত্যানন্দকে 'মদ্যপ' বলেছেন। তা হলে অনাচারীর সঙ্গেও নিমাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে। নিমাইয়ের মূর্ছা-স্বেদ-কম্পকে এসব লোকে বায়ু রোগ বলতেই ভালবাসতো।

কিন্তু বিশ্বম্ভরের অভ্যন্তরে তখন একটা ধীর পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে গোপীপ্রেমও তাঁর অন্তরকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। যিনি সর্বদা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করতেন তিনি এখন 'গোপী' 'গোপী' করতে আরম্ভ করেছেন। একদিন পুরানো বন্ধুদের একজন তাঁকে দেখতে এসে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে গোপীনাম উচ্চারণ করতে শুনলেন।

ঠাট্টা করে সেই সহপাঠী বললেন—

'গোপী' 'গোপী' কেন বল নিমাই পণ্ডিত।
'গোপী' 'গোপী' ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত ॥

ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর বললেন 'দস্যু কৃষ্ণ'—তাকে কোন জন ভজনা করে। শেষ-মেষ রেগে তিনি একটি লাঠি হাতে নিয়ে প্রাক্তন বন্ধুকে মারতে গেলেন। 'পড়ুয়া' তো পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ভক্তগণ এবং সাধারণ মানুষ নিমাইয়ের এই অগ্নিমূর্তি দেখতে পেলেন। আর পড়ুয়ার গায়ে নিমাইয়ের রেগে যাওয়ার কারণ সাতকাহন করে বলতে লাগলেন। শুনে অনেকেই রেগে গেলেন। অন্য সহপাঠীরা সব শুনে একেবারে অগ্নিশর্মা—ভারী তো পণ্ডিত হয়েছে নিমাই, তা বলে গায়ে হাত তুলবে? সে বামুন, আমরাও তো বামুন, আমরা কম কিসে? চল, আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই। সে জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, আমরাও কম বড়ো মানুষের ছেলে নই। এক সঙ্গেই সবাই পড়েছি 'আজি তিঞো গোসাঞি হইল কেমনে।' এই বলে গোটা নবদ্বীপে তারা একটা সোরগোল তুলে দিলেন।

সে সব কথা নিমাইয়ের কানে গেল। তিনি বিমর্ষ হলেন, আর ভাবলেন—এই সব সমালোচনা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়—সন্ন্যাস গ্রহণ। তাহলে তো আর কেউ কোনো কথা বলবে না। জগতের

জীবের কাছে কৃষ্ণতত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা তাহলে ব্যর্থ হবে না। একদি
সকলে মিলে বসে আছেন, এমন সময়ে নিমাই একটি শ্লোকে তাঁ
অন্তরের ব্যথা বললেন—

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে॥

শুনে নিত্যানন্দ এর গূঢ় অর্থ বুঝলেন। আর নিত্যানন্দকে
নিমাই আপন অন্তরের কথা খুলেও বললেন। বললেন—

দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥

—সন্ন্যাসীকে তো কেউ আর মার-ধোর করবে না। নিত্যানন্দ
অনিবার্য জেনে, তাঁর ইচ্ছার অনুমোদন করলেন। কিন্তু শচীর কথ
ভেবে তাঁর চোখে জল এল।

মুকুন্দের বাসায় এসে গৌরচন্দ্র 'শিখা সূত্র ছাড়িয়া' সন্ন্যাসের কথ
জানালেন। শুনে মুকুন্দ কেঁদে ফেললেন। এরপর গেলেন গদাধরে
কাছে এবং একে একে সকলের কাছে গিয়ে বললেন যে 'শিখা সূ
ঘুচাইমু'। সকলেই কাঁদতে শুরু করলেন।

এবারে গৌরাঙ্গ গেলেন নিজের বাড়িতে। পরম্পরায় শচী সন্ন্যাস
গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা শুনেছিলেন। নিমাই যেতেই তিনি মূর্ছাহত হ
পড়ে গেলেন এবং

না যাইয় না যাই বাপ! আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে, তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥ বলে খু

কাঁদতে লাগলেন। বললেন—'তোর সন্ন্যাসে কাজ কি? সবার সং
ঘরে বসেই তো ধর্মাচরণ করা চলে। 'জননী ছাড়িয়া কোন্ ধর্ম ব
বিচার'। বিশ্বরূপ গেছে। তোর বাবাও চলে গেছে। তোর জন্যে
আমি বেঁচে আছি সকল দুঃখ স'য়ে। তুই চলে গেলে আমি নিশ্চয়ই
ম'রে যাবো। সবচেয়ে বড়ো কথা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি কি বল

বোঝাবো। তোর যদি এই মনে ছিল, তবে আবার বিয়ে করলি কেন ?

অনেক কষ্টে নিমাই তাঁকে প্রবোধ দিলেন। বললেন—মাগো আমি যে তোর জন্ম জন্মান্তরের সন্তান। আমি চলে গেলেও আবার তো তোমার কোলেই আসবো। 'এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।' শুনে শচীর মন কিছু স্থির হল।

গৌরাঙ্গ মনে মনে ঠিক করেছেন এই দিনই তিনি গৃহত্যাগ করবেন। কিন্তু নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া শচী বা বিষ্ণুপ্রিয়া কাউকে সে সংবাদ জানালেন না। সকলের সঙ্গে হরি সঙ্কীর্তন করছেন এমন সময় খোলাবেচা শ্রীধর একটা লাউ এনে হাজির। ভক্তের দান ভালোবাসার দান—তা তো খেতেই হবে। এমন সময় একজন দুধ নিয়ে এসে হাজির। মাকে বললেন, মাগো, আজ রান্না কর—দুধ লাউ খেতে আমার বড়ো ভাললাগে। সকলে মিলে খাবো। শচী মনের আনন্দে রাঁধতে গেলেন। শচীর খুব আনন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতেও পারলেন না, আজকেই তাঁর স্বামী-সেবার শেষ দিনটি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা অবশ্য বৃন্দাবন দাস একবারও লেখেন নি। সে তাঁর অনুচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। আবার লোচনদাসের কাব্যের বাড়াবাড়িও অনুচিত। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্য মঙ্গলে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসের পূর্বরাত্রে নিমাইয়ের কথোপকথনের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। অবশ্য এ-ছবি যতই বাস্তবানুগ হোক, সত্য হতে পারে না। এ শুধু বানানো !

কিন্তু অনুমানও অনেক সময় সত্য হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করছেন। হায় সরলা বালিকা ! তাঁর স্বামী চিরদিনের জন্য তাঁকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরচন্দ্র মনের মতো সাজালেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও গৌরচন্দ্রকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ছেন অঘোরে বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাইয়ের চোখে ঘুম নেই। একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে নিমাই দ্রুত অথচ নিঃশব্দ চরণে ঘরের বাইরে এলেন। মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেবের গৃহ ত্যাগের কথা।

আর এদিকে শচী জেগে আছেন—সেকথা লিখেছেন বৃন্দাবন দাস —'আই জানে—আজি প্রভু করিবে গমন।' নিমাই চলে যাচ্ছেন দেখে তিনি অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তুমি ভেবো না। 'তোমার সকল ভার আমার'—নিমাইয়ের এই প্রতিশ্রুতিতেও তিনি প্রবোধ মানলেন না। শেষ পর্যন্ত মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বের হয়ে এলেন।

কিন্তু শচীর ঐ ছবিটিই বোধহয় বেশি মনোরম। যেখানে শচী সারারাত জেগে থেকে শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর সেই সুযোগে নিমাই গৃহত্যাগ করছেন। শেষ রাত্রিতে শচীমা স্বপ্ন দেখলেন—নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন। ধড়মড় করে বিছানায় বসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। দেখলেন তাঁর সর্বনাশ হয়েছে, নিমাই ঘরে নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

ডাকেন জননী "নিমাই! নিমাই!"
প্রতিধ্বনি বলে,—"নাই, নাই, নাই!"
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে; কোথারে নিমাই!

ক্রমে সকাল হতেই সকলে গৃহত্যাগের কথা জানতে পেরেছেন। অন্ধকারের অবসান ঘটেনি। নিমাই কাটোয়ার দিকে ছুটেছেন—কারণ 'ইন্দ্রানি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম'-এ কেশব ভারতী আছেন—তাঁর কাছে তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবেন। তাঁর পেছনে ছুটছেন ভক্তবৃন্দ—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আর ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরতে পারছেন না। বেলা প্রায় দুপুরের সময় তাঁরা সবাই গঙ্গাপার হয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে পৌঁছুলেন।

তাঁকে দেখে কেশবভারতী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। নিমাই তাঁর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন—

কৃষ্ণ-দাস্য হই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥

এই বলে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন। বহু লোক জমে গেল। নিমাই সন্ন্যাস নেবেন শুনে বহুলোক আক্ষেপ করতে লাগলেন। কেউ বললেন—এর মা কেমন করে বাঁচবেন। কেউ বললেন—এঁর স্ত্রীর কি হবে ইত্যাদি।

নিমাইয়ের ভক্তি দেখে কেশবভারতী খুশি হলেন। ভাবলেন তোমাকে শিষ্য করে আমি গুরু হবো—এমন যোগ্যতা কি আমার আছে। শেষে নিমাইয়ের যে প্রার্থনা তা পূরণের আশ্বাস দিলেন তিনি। তখন চন্দ্রশেখর আচার্যকে আবশ্যক আনুষঙ্গিক, যা কিছু করার দায়িত্ব দিলেন।

পরের দিন সকালে মস্তক মুণ্ডনের সময় এল। নাপিত আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাঁদতে লাগলেন! নাপিতের অবস্থা আরও কষ্টকর—

ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥

শেষ অবধি ঐ কঠিন কাজ সমাপ্ত হল। গঙ্গা স্নান সেরে নিমাই সন্ন্যাসের স্থানে এসে বসলেন। কেশবভারতী তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। গেরুয়া বসনে, চন্দনে, মালায়, কমণ্ডলুতে নিমাই এক নবকলেবর ধারণ করলেন। কেশবভারতী ভাবতে লাগলেন কি নাম রাখবেন এই নবীন সন্ন্যাসীর। 'ভারতী'র শিষ্য তো ভারতী-ই হয়ে থাকেন। কিন্তু একে তো সে নাম দিতে পারবো না। শেষে নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' কারণ—

যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া ॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥

এই নামে নিমাইও তুষ্ট হলেন। তিনি হলেন **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। সংক্ষেপে চৈতন্য। এখন থেকে তিনি আমাদের কাছে চৈতন্য নামেই ধরা দিলেন। কিন্তু শচীর কাছে তিনি তাঁর সেই আদরের নিমাই ধন, গৌরচাঁদ, গোরা রায়, বিশ্বম্ভর সোনা।

সন্ন্যাস নিয়ে সেরাত্রি কাটোয়াতে থেকে পরের দিন ভক্তগণ সঙ্গে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি। খবর পেয়ে শচীমাতা এলেন।

অন্যান্য আত্মীয় পরিজনও এলেন। সকলকেই চৈতন্য বোঝালেন। তিনি তো সন্ন্যাসী—তাঁর আর গৃহে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ভেবেছিলেন হয় তো মা তাকে বারণ করবেন। মাকে দেখে বললেন পর্যন্ত—মাগো, তুমি যদি বল আমি ঘরে ফিরে যাবো। তোমার আজ্ঞা পালনে আমি সর্বদা প্রস্তুত। তবে তোমার কাছে সন্ন্যাসজীবনের জন্য অনুমতি চাইছি।

শচী মাতাও তো যে সে লোকের মা নন ; মা বড়ো না হলে কি ছেলে এতো বড়ো হয় ? তাই বুক বেঁধে ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—পুত্রকে কোলে নিয়ে শিরশ্চুম্বন করে অনুমতি দিলেন। বললেন ঠিক আছে। যতদিন নিমাই অদ্বৈত-গৃহে থাকবেন, ততদিন তিনি সকলকে ভিক্ষা দেবেন—এই প্রার্থনা চেয়ে নিলেন। আর বললেন ছেলেকে আটকে রাখবেন না—

তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ।

নিজের দুঃখ নয়, তার সুখকেই আমি নিজের সুখ বলে মনে করি !

শ্রীচৈতন্য মায়ের কথা শুনে বললেন—ভাবনা কেন, নীলাচল বঙ্গদেশ থেকে কতদূরেই বা। লোকজন তো যাতায়াত করছেন। মা তো আমার খবর নিয়মিত পাবেনই। এই বলে উপস্থিত সকলের কাছে তাঁর নীলাচল যাত্রার অনুমোদন চাইলেন—

'আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন'।

হরিদাস কাঁদতে লাগলেন। দেখে চৈতন্য বললেন—তোমাকে আমি নীলাচলে নিয়ে যাবো। অদ্বৈতের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে আরও দু'চার দিন থেকে গেলেন। মা রান্না করলেন। ভক্তগণকে নিয়ে চৈতন্য মায়ের কাছে সানন্দে ভোজন করলেন। কয়েকদিন পরে ভক্তগণকে বললেন। এবারে তোমরা নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে সঙ্কীর্তন কর। আমি মাঝে মাঝে আসবো, গঙ্গাস্নান করবো। তোমরাও মাঝে মাঝে যেয়ো। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত আর মুকুন্দ দত্তকে নিয়ে তিনি নীলাচল যাত্রা স্থির করলেন। (বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ,

গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের নাম লিখেছেন)।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ অথবা বৃন্দাবন দাস—দুজনেরই কেউ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলেননি। বিষ্ণুপ্রিয়া এঁদের কাব্যে উপেক্ষিতা। কিন্তু চৈতন্য কি একবারও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবেন নি। শচীমাতার বেদনার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু উপেক্ষিতা অবহেলিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি কোনো অন্তর্বেদনাই উপস্থিত হয়নি? সন্ন্যাসীর মাতৃদর্শন নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু পত্নী দর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু পত্নীর কি একবারও সেই অনিন্দ্যসুন্দর সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুটি কথা বলার জন্যে মন উন্মুখ হয়েছিল না? অথচ কোনো কোনো কাব্যে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের মূর্তি পূজা করতেন। সন্ন্যাসী তাঁর ধর্ম পালন করেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর এই অবহেলায় পরম দুঃখিত হন। চৈতন্যের প্রতি মন ক্ষণকালের জন্যও বিরূপ হয়। স্ত্রী-পুরুষ—সে তো ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বরেরই বিধান। তবে কেন পুরুষ তাঁর আত্মগরিমায় স্ত্রীকে অবহেলা করবে? চৈতন্য এই মানবিক সম্পর্ককে অবহেলা করেছেন সন্দেহ নেই।

বোধ করি এই বিষয়টিকে চাপা দেবার জন্য এই কথাও প্রচারিত আছে যে, চৈতন্য নাকি বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্মরণ করে তাঁর খড়ম দুটি শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ যেন রামের অনুপস্থিতিতে ভরতকে খড়ম দিয়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা। খড়ম একটা মানুষের ভালোবাসার প্রতিনিধিত্ব কি করতে পারে?

১৮

মায়ের মতো ভালবাসতেন নিমাইকে অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা দেবীও। তিনিও খুব যত্ন করে রান্না করলেন চৈতন্যের নীলাচলে যাবার আগের রাতে। শালিধানের চালের ভাতের উপর ঘি, মুগের ডাল, শাক, পটোল, কুমড়ো-বড়ি, মানকচু, সুক্তো, কচি নিমপাতা দিয়ে বেগুন ভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, নারকেল, ছানা, মিষ্টি, মধু, মোচাঘণ্ট, দুধ, পাঁচ ছরকমের টক, মুগ-মাষকলাই—কলার বড়া, ক্ষীর, পিঠে, পায়েস, চিড়ে কলা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি রান্না হয়েছিল বলে কৃষ্ণদাস

কবিরাজ জানিয়েছেন। তৃপ্তি সহকারে খেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি গঙ্গার তীর ধরে নীলাচলের দিকে হাঁটতে থাকলেন। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে খড়িগ্রাম-ছত্রভোগে এইভাবে গিয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, ছত্রভোগে যাবার আগে তিনি প্রথমে রাঢ় দেশে আসেন। এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভিক্ষাবৃত্তি ও রাত্রি যাপন করে সবাইকে রাত্রে ছেড়ে ফেলে একা চলতে লাগলেন। সঙ্গীরা জানতে পেরে পিছনে ধাওয়া করে তার নাগাল পান। পশ্চিম-পূর্ব নানা দিকে ঘুরে তিনি বক্রেশ্বরে আসেন। ঐ অঞ্চল কৃষ্ণনামবিহীন ছিল বলে তিনি সেখানে নাম প্রচারের জন্য যান। চলতে চলতে এলেন এক সময়ে গঙ্গাতীরে এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে নাম প্রচারের আদেশ দিলে নিত্যানন্দ তাই পালনের জন্য ফিরে যান। চৈতন্য নদীতীর ধরে পুনশ্চ শান্তিপুরে ফিরে আসেন এবং শচীসহ বহু ব্যক্তির সঙ্গে পুনশ্চ তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

কদিন অদ্বৈতগৃহে রাত্রি কাটিয়ে পুনশ্চ চৈতন্য নীলাচল অভিমুখে রওনা হন এবং ধীরে ধীরে 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' ছত্রভোগে এসে পৌঁছান। সেখানে গঙ্গা শতমুখী হয়ে সমুদ্রগামী হয়েছে। সেখানে স্নান সেরে সেই গ্রামের অধিকারী (জমিদার) রামচন্দ্র খানের সঙ্গে পরিচিত হলেন। চৈতন্যের প্রবল আর্তি দেখে তিনি বিস্মিত। চৈতন্যকে সঙ্গীগণ বলে দিলেন, এই রামচন্দ্র খান হলেন 'এই অধিকারী প্রভু! দক্ষিণ রাজ্যেতে।'

চৈতন্য বললেন—খুব ভাল হল। এখন আমাকে তাড়াতাড়ি নীলাচলে যাবার ব্যবস্থা করে দাও দেখি। রামচন্দ্র খান যা বললেন উত্তরে, তাতে সেসময়ে দেশের রাজনৈতিক চেহারার একটা ছবি পাওয়া যায়। তিনি বললেন, আপনি যা বললেন তা পালন করা আমার কর্তব্য। কিন্তু সময় খুব খারাপ—এ দেশ থেকে ওদেশে যাবার কোনো উপায় নেই—কেউ যায় না। রাজারা ত্রিশূল পুঁতে যাবার পথ বন্ধ বলে নিশানা দিয়েছেন। কোনো পথিক পেলে দস্যুরা জ্যান্ত মেরে ফেলে। তোমাকে কোন্ দিক দিয়ে লুকিয়ে পাঠাই বুঝতে পারছিনা। যাই

হোক্—এখানকার ভার আমার। কেউ খোঁজ পেলে সে আমারই বিপদ। তবুও আমি তোমার আজ্ঞা পালন করবোই। তবে একটা বিনয়, সবাইকে নিয়ে তুমি আজ এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ কর। আজ রাত্রে আমি তোমাকে পাঠাবোই।

রাত্রে রামচন্দ্রের বাড়িতে সবাই অতিথি হলেন এবং আহার গ্রহণ করলেন। তখন থেকেই সমানে 'জগন্নাথ কতদূর' 'নীলাচল কতদূর' বলে চৈতন্য প্রায়শই হুঙ্কার দেন। 'এইমত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর'—রামচন্দ্র খান এসে খবর দিলেন 'নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান'। হরিধ্বনি দিয়ে চৈতন্য আর তাঁর সঙ্গীরা নৌকায় গিয়ে বসলেন। মুকুন্দ কীর্তন আরম্ভ করলেন। নাইয়া বা মাঝি ভয় পেয়ে গেল—মহাবিপদ, চুপ কর, নইলে আজ আর প্রাণে রক্ষা পাবো না। দস্যুরা এসে নৌকা লুট করে প্রাণে মেরে ফেলবে। যতক্ষণ না 'উড়িয়ার দেশ' পাচ্ছ দয়া করে 'তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি'। চৈতন্য দমলেন না, কীর্তন চলতে লাগলো।

যাই হোক্ কোনো বিপদ হলনা—মহাপ্রভু 'শ্রীউৎকল দেশে' প্রবেশ করলেন। নৌকা গঙ্গাপার হয়ে শ্রীপ্রয়াগঘাটে হাজির হল। মহাপ্রভু তটে নামলেন। তারপর গঙ্গাঘাটে নেমে স্নান করলেন। তারপর ভিক্ষা করতে লাগলেন। সারারাত ধরে সেই গ্রামে সঙ্কীর্তন করলেন। ক'দিন পরে পার হলেন সুবর্ণরেখা। সঙ্গীগণ পিছিয়ে পড়েছেন দেখে চৈতন্য একটু বিশ্রাম নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরে নিত্যানন্দ-জগদানন্দরা এসে পড়লেন। এখানে নিত্যানন্দ দণ্ড ভেঙ্গে ফেললে চৈতন্য তাঁকে প্রবল ক্রোধভরে তিরস্কার করেন। তারপর তাঁরা গেলেন জলেশ্বর গ্রামে। সেখানে গিয়ে চৈতন্যের রাগ প'ড়ে গেল। সেখানে এক রাত্রি অতিবাহিত করে সকালে ভক্তদের নিয়ে বাঁশধায় পৌঁছলেন। শেষে এসে পৌঁছলেন সুখ্যাত রেমুণায়। রেমুণা হল বালেশ্বরের একটি গ্রাম—গোপীনাথের মন্দিরের জন্য সুখ্যাত। সঙ্গীসহ এখানেও চৈতন্য রাত্রি যাপন করলেন।

এই গোপীনাথ 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামেই বেশি খ্যাত।

কেন এই বিগ্রহের নাম 'ক্ষীরচোরা' হল নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত জিগ্যেস করলে চৈতন্য একটি মনোরম আখ্যান ভক্তদের শোনালেন। আখ্যানটি গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনকে ঘিরে। গোপীনাথের পূজারী মাধবেন্দ্র একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে গোপীনাথ তাঁকে বলছেন—সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরী এই মন্দিরে অতিথি হয়ে রয়েছেন। এক বাটি ক্ষীর আমি তাঁর জন্যে লুকিয়ে রেখেছি। তুমি ঘুম থেকে এখনি উঠে ঐ ক্ষীর মাধবেন্দ্রকে দাও।

পূজারী ঘুম থেকে উঠেই দেখেন, সত্যিই তো গোপীনাথের কাপড়ের মধ্যে এক বাটি ক্ষীর। সেই ক্ষীর নিয়ে তিনি মাধবেন্দ্রকে খেতে দিলেন। ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্য গোপীনাথ নিজে ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন বলে তিনি 'ক্ষীর চোরা গোপীনাথ' নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

মাধবেন্দ্র পুরী—বৃন্দাবনে একক কৃষ্ণ ভজনার সেই বিখ্যাত নিষ্ঠাবান ভক্ত—চন্দন আনার জন্য প্রতিবছর দক্ষিণ দেশে যেতেন। যাবার সময় এই বঙ্গদেশেও আসতেন। তাঁর নিষ্ঠা ও প্রেমই চৈতন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

এবারে এলেন যাজপুরে। যাজপুরের সব পুণ্যস্থান সেরে এলেন কটক-নগর। সাক্ষীগোপাল, গুপ্তকাশী, কমলপুর, আঠারনালা সেরে চৈতন্য—

মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥

পিছনে শিষ্যবর্গকে নিয়ে চৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

১৯

অবশেষে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রভু হইলা অস্থিরে॥

জগন্নাথ মূর্তি দর্শন মাত্রই চৈতন্যের মধ্যে প্রবল আবেগ উপস্থিত হল। ইচ্ছে হ'ল ঐ মূর্তিকে কোলে নিয়ে একবার ঈশ্বরস্পর্শ সুখ অনু-

ভব করেন। ছুটে যেতে গিয়ে একেবারে মূর্তিত্রয়ের সামনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অমনি হাঁহাঁ করে ছুটে এলো পড়িছা-প্রতিহারীর দল। গৌরচন্দ্রকে তারা এই মারে তো ঐ মারে। প্রবীণ ব্রাহ্মণ বাসুদেব সার্বভৌম তখন ঐ মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। তিনি একেবারে চৈতন্যের পিঠের উপর প'ড়ে আড়াল করে বললেন—মেরো না তোমরা একে মেরো না। দেখছো না—এ নবীন সন্ন্যাসী, এর কোনো কুম-তলব নেই।

পড়িছারা থেমে গেলো। অন্যেরা নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। কিন্তু বাসুদেব সার্বভৌমের কথা তাঁরা ফেলতে পারে না। কারণ সার্বভৌম শুধু প্রখ্যাত পণ্ডিতই নন, পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রের তিনি গুরু ও প্রধান সভাপণ্ডিত।

সার্বভৌম অনিমেষ নয়নে মূর্ছাহত চৈতন্যের দেহলাবণ্য এবং তাঁর দেহে আকুল আর্তির প্রকম্প লক্ষ্য করেছিলেন। আর ভাবছিলেন—এই পুরুষ সিংহ তো সামান্য মানুষ নন। মন্দিরের অন্য দর্শকেরাও অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন এই নবীন ভক্তের ভক্তির আকৃতি। দীর্ঘক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল চৈতন্যের দেহ। এদিকে দেবতার ভোগনিবে-দনের সময় উপস্থিত। বাইরের লোকেরা একে একে চলে যাচ্ছেন। চৈতন্যের দেহ ভূলুণ্ঠিত।

সর্ব ভেবে বাসুদেব সার্বভৌম পড়িছাদের ডেকে বললেন—দেখ বাপু, তোমরা সকলে এঁকে ধরাধরি করে আমার বাড়িতে রেখো এসো। প্রায় প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটিকে সকলে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

নিত্যানন্দ-জগদানন্দের দল একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। চৈতন্যের আবেগের দৌড়ে তাঁরা সমকক্ষ হতে পারেন নি। তাঁরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছেন এমন সময় মন্দির প্রত্যাগত লোকেদের মুখে শুনতে পেলেন—এক নবীন সন্ন্যাসী, মুণ্ডিত মস্তক, জগন্নাথ মন্দিরের সামনে মূর্ছিত আর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। তাঁকে তো পুরোহিতেরা মেরেই ফেলতো। নেহাৎ বাসুদেব সার্বভৌম ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়া করে সন্ন্যাসীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

নিত্যানন্দ খোঁজ নিয়ে সব শুনলেন। সব শুনেই বুঝতে পারলেন এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেউ নয়—এ তাঁর প্রিয় নিমাই, এ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বলতে বলতে তাঁরা সিংহদ্বারে পৌঁছে গেলেন।

এখানে হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো নদীয়ার পণ্ডিত বিশারদের জামাই গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে। গোপীনাথ আবার বাসুদেব সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। তিনি মনে মনে নিমাইয়ের ভক্ত ছিলেন আর চিনতেন মুকুন্দ আচার্যকেও। দুজনে দুজনকে এরকম স্থানে দেখে অবাক। মুকুন্দ এগিয়ে গিয়ে গোপীনাথাচার্যকে প্রণাম করলেন। কথাপ্রসঙ্গে, গোপীনাথ নিমাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানতেন না। এখন মুকুন্দের কাছে সেকথা জানতে পারলেন এবং সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন তাও জানতে পারলেন।

মুকুন্দ বিষণ্ণ হয়ে বললেন—চৈতন্য একটু দ্রুত চলে এসেছেন বলে নাগাল পাইনি। শুনছি এই রকম একটি সন্ন্যাসী মন্দিরে ঢুকে বিপদ ঘটিয়েছেন।

গোপীনাথ বললেন, ভেবো না। চলো দেখি, কি হয়েছে। আমারও মনে হচ্ছে ঐ সন্ন্যাসী চৈতন্যই। চলো, সবাই আমরা সার্বভৌমের বাড়ি যাই।

সেখানে গিয়ে সবাই আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এতোখানি বেলা হয়েছে, তখনও চৈতন্য-দেহ নিস্পন্দ। পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ ঈশ্বরাবেগে আরও অবসন্ন হয়ে একেবারে মৃতবৎ। কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না সার্বভৌম। এঁরা সবাই এসে পড়ায় একটু স্বস্তি পেলেন। সকলে ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁদের প্রিয় নিমাই অচেতন।

শুধু মুকুন্দ মনে মনে সাহস পাচ্ছেন। তিনি বৈদ্য। কিন্তু জানেন, কোনো জাগতিক ঔষধে এই অসুখ সারবার নয়। অতএব পরমার্থ ঔষধ প্রয়োগ করলেন। স্বীয় সুকণ্ঠে গাইতে লাগলেন হরিনাম সং-কীর্তন। সেই অচেতন দেহে সহসা প্রাণের সঞ্চার হল।

উচ্চ করি করে সবে নামসংকীর্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চৈতন ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।

বাঁচলেন সার্বভৌম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহাপ্রভুর সঙ্গীগণ। আনন্দ পেলেন সমবেত নীলাচলবাসীগণ।

সার্বভৌম সমাগত অতিথিবৃন্দকে ডেকে বললেন—আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আপনারা দূর দেশ থেকে আসছেন, আজ রাত্রে আপনারা সকলে আমার কাছে সেবা গ্রহণ করবেন। চৈতন্য সমুদ্র স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। সঙ্গীরাও পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। লাবরার তরকারি আর পিঠাপানায় তৃপ্ত হলেন সকল অভ্যাগত।

আহারান্তে চৈতন্য সুস্থ হলে সার্বভৌম এসে উপস্থিত হয়ে পরস্পর সৌজন্য প্রকাশ করলেন। তারপর গোপীনাথ আচার্যকে প্রশ্ন করে মহাপ্রভুর সবিস্তার পরিচয় জানলেন। সার্বভৌম আগেই নীলাম্বর চক্রবর্তীকে চিনতেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর পিতা পণ্ডিত বিশারদের সতীর্থ। সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর কাছে নিজেকে সেবক হিসেবে নিবেদন করে সার্বভৌম নিজের বিনয় প্রকাশ করলেন। আর বলে দিলেন—কখনও যেন চৈতন্য একাকী জগন্নাথ দর্শনে না যান। গোপীনাথ নিয়ে গেলে ভাল। আর চৈতন্যের থাকার জন্য নিজের মাসীর বাড়ির ঠিকানা বলে দিলেন।

সেই মত চৈতন্য সার্বভৌমের মাসীর বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলেন। গোপীনাথাচার্য প্রতিদিন তাঁকে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে আনতেন।

সার্বভৌম কিন্তু চৈতন্য বিষয়ে কৌতূহলী হয়েই রইলেন। কখনও গোপীনাথ, কখনও মুকুন্দ দত্তকে চৈতন্যের 'সম্প্রদায়', শিক্ষা, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে চৈতন্যকে বেদান্ত পড়ানোর পরামর্শ দিলেন। গোপীনাথের কাছে সে কথা শুনে মহাপ্রভু যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করলেন। তারপর একদিন জগন্নাথ মন্দিরে উভয়ের দেখা হলে

চৈতন্য সার্বভৌমের কাছে বেদান্ত পড়তে চাইলেন।

শুনে সার্বভৌম চৈতন্যকে বেদান্তের গূঢ় কথা শোনাতে লাগলেন। প্রশ্নহীন বাধ্য ছাত্রের মতো সাতদিন ধরে চৈতন্য তাঁর ব্যাখ্যান শুনলেন। হঠাৎ সার্বভৌমের মনে হল—কই চৈতন্য তো কোনো প্রশ্নই করেন না। তাই অষ্টম দিবসে প্রশ্ন করে বসলেন—কই তুমি তো কোনো কথা জিগ্যেস করছ না, তুমি বুঝতে পারছ কি পারছ না—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

চৈতন্যের মধ্যে সেই পণ্ডিত নিমাই হঠাৎ যেন পুনর্বার প্রকাশিত হলেন। বললেন—আমি হয়তো বোকা, তাই আপনার ব্যাখ্যান বুঝতে পারছিনা।

স্বভাবতই রেগে গেলেন সার্বভৌম। বুঝতে না পারছ তো সে কথা বলছ না কেন?

শুনে পূর্ববৎ বিনয়ের সঙ্গে চৈতন্য নিজেই শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খণ্ডন করে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন।

সার্বভৌমের পণ্ডিত অভিমান হঠাৎ দূরে গেল। তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন চৈতন্যের জ্ঞানের পরিমাণ লক্ষ্য করে।

সার্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ আমি জানি সর্বথায়॥

চৈতন্য তখন তাঁকে 'অষ্ট আখরিয়া' একটি শ্লোক ভাগবত থেকে ('৭ম স্কন্ধ ১০ম শ্লোক) শোনালেন—যার অর্থ 'যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত বা যাঁহাদিগের অহঙ্কার গ্রন্থি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মারাম মুনিগণ ও অতিপরাক্রম ভগবানে ফলকামনাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেন না, শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

সার্বভৌম এই শ্লোকের ৯ রকম ব্যাখ্যা করলেন। চৈতন্য করলেন ১৮ রকমের ব্যাখ্যা। সার্বভৌম পুনরায় বিস্মিত হলেন। এবার চৈতন্য প্রশ্ন করলেন—

প্রভু বোলে "সার্বভৌম! কি তোর বিচার
সন্ন্যাসে কি আমার নাহিক অধিকার?"

বাসুদেব আত্মসমর্পণ করলেন এবং এক শত শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা করলেন। এই শত শ্লোক 'সার্বভৌম শতক' বলে আখ্যাত। সার্বভৌম ভক্তিধর্মের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তাঁর কাছে চৈতন্যের কথা শুনে উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত মোহিত হয়ে গেলেন।

চৈতন্য তখন পরমানন্দে 'হরিনাম' প্রচারে নিমগ্ন হলেন। ইতো-মধ্যে পর্যটন থেকে ফিরে এসেছেন পরমানন্দ পুরী। তাঁকে দেখে চৈত-ন্যের আনন্দের অবধি মাত্র রইল না। চৈতন্য তাঁকে 'রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া।' এর পর এসে মিললেন 'সঙ্গীতরসময়' স্বরূপ দামোদর। সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও গৃহীর মতো পোষাক পরতেন বলে দামোদরের নাম হয়েছিল স্বরূপ দামোদর। একে একে এসে মিলতে লাগলেন প্রত্যুম্ন মিশ্র, ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ। শেষ অবধি চৈতন্য সমুদ্রতীরে এসে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে সংকীর্তন আর বৈষ্ণবসঙ্গে তাঁর দিন অতিবাহিত হতে থাকল।

গদাধরের একনিষ্ঠ সেবা, পরমানন্দের হাস্য পরিহাস, বিদ্যাবাচস্প-তির ভক্তিচিত্ততা এবং প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের বিনম্রতা সমু-দ্রতীরের স্নিগ্ধতাকে পবিত্রতর করে তুললো। বস্তুত পক্ষে প্রতাপরুদ্র এবং কাশীমিশ্রের আনুকূল্য চৈতন্যকে ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

২০

সার্বভৌমকে উদ্ধার করার পর 'দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।' উত্তর ভারত, দক্ষিণ পূর্ব ভারত ভ্রমণ কিছুটা হয়েছে। এখন দক্ষিণ ভারত পর্যটনে ইচ্ছা জাগল। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে সন্ন্যাস নিয়ে ফাল্গুনে এসেছিলেন নীলাচলে বাস করতে। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা দেখলেন। বৈশাখের প্রথমে 'দক্ষিণ যাইতে হৈল মন।' সকলকে ডেকে এনে সে ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। আর বললেন 'একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব।' যতদিন সেতুবন্ধ থেকে ফিরে না আসি, তোমরা সবাই নীলাচলেই থাক। নিত্যানন্দ বললেন, আমি দাক্ষিণাত্যের সব পথ জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। কিন্তু চৈতন্য জেদ ধরেছেন 'একাকী

ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া।' শেষ অবধি ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে জলপাত্র-বর্হিবাস বহন করার জন্য 'কৃষ্ণদাস' নামে একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন (অপ্রামাণিক গোবিন্দ দাসের কড়চা অনুসারে এই সঙ্গীর নাম গোবিন্দদাস কর্মকার—আমরা এই নাম মানতে প্রস্তুত নই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'কৃষ্ণদাস' নামটি লিখেছেন—সেটিকেই আমরা প্রমাণ্য মনে করি। এবং একারণেই 'গোবিন্দদাস'—বর্ণিত ভ্রমণ বিবরণ আমরা গ্রহণ করলাম না)।

আরও কয়েকটি দিন ভক্ত সঙ্গে নীলাচলে কাটিয়ে অবশেষে চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করে মালা-প্রসাদ নিয়ে আলাল-নাথ পথে সমুদ্রতীরে এলেন। এখানে সার্বভৌম বলে দিলেন 'রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।' তিনি রসিকভক্ত। আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন। কুসুমাদপি কোমল চৈতন্য বজ্রাদপি কঠোর হয়ে ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করে যেতে চাইলেও ভক্তরা সঙ্গ ত্যাগ করেন না। জীবন্ত জগন্নাথকে কেউ ছেড়ে দিতে চান না। চৈতন্য চলেছেন—মুখে কেবল কৃষ্ণ নাম—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এভাবে যেতে যেতে পৌঁছলেন কূর্মস্থান। এই ভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি এগিয়ে চললেন। অনেকদিন চলে পেঁাছলেন জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে। সেখানের নৃসিংহ মূর্তি দেখে বড়ো আনন্দ হল তাঁর। দেখলেন গোদাবরী নদী, মনে পড়ে গেল যমুনা নদীর কথা।

গোদাবরী পার হয়ে স্নান করে ঘাটে বসে চৈতন্য নাম সংকীর্তন করছেন—

হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইল বাজনা বাজায়॥

৭ই বৈশাখ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য বের হয়েছিলেন যে রামানন্দের সাক্ষাৎ মানসে-সেই রামানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে হাজার খানেক মানুষ—কেউ কেউ বাজনাও বাজাচ্ছে। চৈতন্যই প্রথমে রামানন্দকে দেখতে পেলেন। উৎকণ্ঠিত হলেন পরিচিত হবার জন্যে। কিন্তু

এতো লোক। একটু সামলে নিলেন। এবার রায়ও দেখতে পেলেন সূর্যশতকান্তি অরুণ বসন পরিহিত পদ্মলোচন কৃষ্ণচৈতন্যকে। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারাদি জানালেন। চৈতন্য জিগ্যেস করলেন—তুমি কি রায় রামানন্দ ?

যেই রামানন্দ বলেছে হ্যাঁ 'মুঞি দাস, শূদ্র, মন্দ।' অমনি দুটি বিশাল বাহু দিয়ে চৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু সঙ্গের ব্রাহ্মণেরা একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লেন—তাঁদের জিজ্ঞাসা-এই সন্ন্যাসী শূদ্র রামানন্দকে 'আলিঙ্গয়া কেন করেন ক্রন্দন।'

যাই হোক, দুজনে সুস্থ হয়ে বসলেন। চৈতন্য বললেন—আপনার কথা আমাকে সার্বভৌম আগেই বলেছেন। তাঁর জন্যেই আপনার সঙ্গে আমার মিলন হল। তারপর দুজনের ক্রমশঃ বিনয় প্রকাশ। এমন সময় এক বৈদিক ব্রাহ্মণ এলে চৈতন্যকে আহারের নিমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজী হলেন। আপাততঃ রামানন্দ বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যের সময় স্নান ইত্যাদি সেরে চৈতন্য ব্রাহ্মণের ঘরে অপেক্ষা করছেন রামানন্দের জন্যে। এমন সময় তিনি এলেন এবং দুজনের মধ্যে বৈষ্ণব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। সেই আলোচনার প্রথম বিষয় ছিল 'সাধ্য' কে—অর্থাৎ সাধনার বস্তু কী? চৈতন্য প্রশ্ন করেন, রামানন্দ একে একে তার উত্তর দেন। প্রশ্ন যত সূক্ষ্ম হয়, উত্তরও তত সূক্ষ্মতর হয়। এমনি করে কৃষ্ণকে ও রাধাকে পাবার নানা উপায় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন। চৈতন্যের যে উত্তর মনোনীত হয় না—বলেন, এ হল বাইরের কথা, এহো, বাহ্য, আগে কহ আর।' যেটি পছন্দ—তাতে বলেন 'এহো হয়'—আরও বল।

রামানন্দ তো অবাক—প্রশ্নের যে শেষ নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন চৈতন্য নিশ্চয়ই কোনো মায়াবাদী সন্ন্যাসী নন, তিনিই হয়ত স্বয়ং ঈশ্বর। বললেন, চালাকি করবেন না। আপনি কে বলুন। শেষে চৈতন্য আপন স্বরূপ প্রকাশ করলেন। রামানন্দ বিমুগ্ধ হলেন।

এমনি করে দশদিন ধরে ঐ বিদ্যানগরে থেকে চৈতন্য রামানন্দ রায়ের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনা করলেন। এবার চৈতন্যের আরও

যাওয়ার পালা। যাবার সময় বলে গেলেন—দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে তাঁরা দুজনে একসঙ্গে নীলাচলে বাস করে রাত্রিদিন কৃষ্ণকথা বলবেন। রামানন্দ একথায় রাজী হলেন।

ঘুরতে ঘুরতে ৩রা মাঘ ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে ১ বছর ৮ মাস ২৬ দিন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে চৈতন্য আবার নীলাচলে ফিরে এলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে চৈতন্যের লাভ হল বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণ কর্ণামৃত' নাটক ও 'ব্রহ্মসংহিতা' উদ্ধার করে। আর দর্শন করেছিলেন শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র, রামেশ্বর সেতুবন্ধ, দ্বারকাতীর্থ, মাহিষ্মতীপুরী, পঞ্চবটী, নাসিক প্রভৃতি তীর্থ।

কোনও জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে এই ভ্রমণকালে তিনি প্রসিদ্ধ ভক্তকবি 'অভঙ্গ'-খ্যাত তুকারামের সঙ্গে পরিচিত হন।

চৈতন্য নীলাচলে ফিরে এলেন। ভক্তগণ আকুল আগ্রহে এই প্রায় পৌনে দু'বছর কাটাচ্ছিলেন—কবে তাঁদের কৃষ্ণচৈতন্য ফিরে আসবেন। ফিরে আসতেই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সার্বভৌম, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে চৈতন্য পুনশ্চ হরিসংকীর্তনে মগ্ন হলেন।

২১

চৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণরত তখন একদিন উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সেখানে বসে সার্বভৌমকে জিগ্যেস করলেন—শুনলাম, তোমার বাড়িতে গৌড়দেশ থেকে এক 'মহাশয়' মানুষ এসেছিলেন। তাঁকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে।

সার্বভৌম বললেন—আপনি ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু তিনি তো আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি 'বিরক্ত-সন্ন্যাসী'—স্বপ্নেও রাজ-দর্শন করেন না। তবুও আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। দক্ষিণ ভ্রমণে গেছেন।

প্রতাপরুদ্র বললেন—সে কি কথা, তুমি যেতে দিলে কেন, হাতে পায়ে ধরে রাখতে হত।

সার্বভৌম বললেন—তিনি শিগ্‌গির ফিরবেন। একস্থানে তিনি বেশিদিন থাকেন না। কাশী মিশ্রের বাড়িটি নির্জন বলে সেখানে গিয়ে থাকেন।

তারপর চৈতন্য ফিরে এলেন। সবাই আনন্দিত। কাশী মিশ্রের ঘরে সবার সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক হল। সেইমত চৈতন্যের সঙ্গে সার্ব-ভৌম সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জগন্নাথ-সেবক জনার্দন, কৃষ্ণদাস, শিখি মাহিতী, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, মুরারি মাহিতী, বিষ্ণুদাস, প্রহরাজ মহাপাত্র পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি ভক্তগণ পরিচিত হয়ে বিগলিত হলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায়ও পাঁচটি সন্তানসহ পরিচিত হলেন।

এই 'রাধাকান্তের মঠে' এসে উপস্থিত হলেন পুরুষোত্তম আচার্য—যার নাম আমরা আগেই বলেছি স্বরূপ দামোদর। অন্যান্যরাও এসে-ছিলেন—সে কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়ে নিলেন চৈতন্য ভক্তবৃন্দ। চৈতন্য নীলাচলে ফিরেছেন এই খবর তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন শচীর কাছে নবদ্বীপে। 'কালিয়া কৃষ্ণদাস' সে খবর নিয়ে গেলেন শচীর কাছে। শচীসহ নবদ্বীপের চৈতন্য অনুরাগীবৃন্দ খুব খুশী হলেন। সবাই দু'দিন ধরে আনন্দ করে ঠিক করলেন যে তাঁরা সকলে নীলাচলে যাবেন চৈতন্য দর্শনে। সেইমত কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন পরমানন্দপুরী, কমলাকান্ত প্রভৃতিকে নিয়ে শচীমাতার আজ্ঞা পেয়ে অদ্বৈত আচার্য নীলাচলে এসে মিলিত হলেন। তাঁরা এসে বললেন—আরও ভক্তবৃন্দ আসছেন চৈতন্যকে দেখতে। উল্লেখযোগ্য ভক্তগণ চৈতন্যের সেবার অধিকার পেলেন।

এদিকে প্রতাপরুদ্র অস্থির হয়ে পড়েছেন চৈতন্য-মিলনের জন্য। বার বার সার্বভৌমকে তাগাদা দেন আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। সার্বভৌম প্রস্তাব জানালে চৈতন্য কানে আঙুল দিয়ে বললেন—এই 'অযোগ্য বচন' আমাকে বলছেন, সন্ন্যাসীর কি রাজদরশন করতে আছে?

সার্বভৌম তর্ক আরম্ভ করলে চৈতন্য বললেন 'ঐছেবাত পুনরপি মুখে না আনিবে।' যদি আন, তবে আমি এখান থেকে চলে যাবো। সার্বভৌম ভয় পেয়ে পালালেন।

এমন সময়ে রায় রামানন্দ এসে পৌঁছলেন। প্রতাপরুদ্র তাঁকে ধরে বসলেন। রামানন্দের প্রস্তাব শুনে চৈতন্য গম্ভীর হয়ে বললেন—কৃষ্ণ তাঁকে কোনো সময়ে হয়তো 'অঙ্গীকার' করবেন। রামানন্দ আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

কটক থেকে আবার রাজা প্রতাপরুদ্র এসে সার্বভৌমকে জিগ্যেস করলেন—চৈতন্যকে আমার কথা বলেছিলেন ?

সার্বভৌম সব কথা জানালেন। রাজা বড় ক্ষুণ্ণ হলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—আচ্ছা, প্রতাপরুদ্রকে তিনি কৃপা করবেন না ?

যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥

সার্বভৌম এবারে আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আরও একটু অপেক্ষা করুন। রথের সময় আবার এসে গেল। রথযাত্রার সময় চৈতন্য যখন পুষ্পোদ্যানে যাবেন তখন তুমি রাজবেশ ত্যাগ করে ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক কীর্তন করতে আরম্ভ করবে। তারপরে একা গিয়ে চৈতন্যচরণে আশ্রয় নেবে।

শুনে 'গজপতি-মনে সুখ উপজিল'। ইতোমধ্যে বঙ্গদেশ থেকে দর্শনার্থীরা এসে পড়লেন। প্রতাপরুদ্র আগ্রহে তাদের আহার ও বাস-স্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। অট্টালিকার উপরে তিনি উঠলে গোপীনাথ আচার্য একে একে আগত ভক্তবৃন্দের পরিচয় দিতে লাগলেন।

এদিকে চৈতন্যও ভক্তগণকে কাছে পেয়ে খুব আনন্দিত।

আপন-নিকটে প্রভু সবারে বসাইল।
আপন শ্রীহস্তে সবায় মালা-চন্দন দিল॥

হঠাৎ প্রভুর খেয়াল হল—কই মুরারি গুপ্তকে তো দেখছি না। সে কোথায় গেল ? খবর পেয়ে মুরারি দাঁতে তৃণগুচ্ছ ধরে দেখা করতে গেলেন। চৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেলে 'মোরে না ছুঁইহ আমি

'অধম পামর' বলে মুরারি পালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে ধরে আলিঙ্গন দিয়ে কাছে বসালেন।

আবার মনে হল হরিদাস ঠাকুর কই? 'কাঁহা হরিদাস?' ভক্তরা রাজপথে দণ্ডায়মান 'দীন' হরিদাসকে ধরে নিতে এলে হরিদাস বললেন,

মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥

এই দীনতা চৈতন্যকে খুশী করেছিল। তবে আমাদের যেমন প্রত্যাশা ছিল চৈতন্য নিজে গিয়ে হরিদাসকে বরণ করে আনবেন, তাই ঘটল। একটু পরে অন্য ভক্তদের বিদায় দিয়ে চৈতন্য হরিদাসের কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং হরিদাস নিজেকে অস্পৃশ্য বললে চৈতন্য অপূর্ব কথা বললেন—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

যে চৈতন্য ঘোষণা করেছিলেন 'চণ্ডালহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ' —তাঁর এই আচরণ, অত্যন্ত সঙ্গত ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছিল। আজকের দিনেও যাঁরা সাম্প্রদায়িকতা এবং শুচিবাই রোগে ভুগছেন—চৈতন্যের জীবন তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ।

কাশী মিশ্রের কাছে ইতোমধ্যেই চৈতন্য যে নির্জন পুষ্পোদ্যানটি সাধনার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন, সেই নিভৃত কক্ষে হরিদাসকে তিনি নিয়ে গেলেন। এবং বললেন—

এই স্থানে রহ কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥

এখান থেকেই তুমি মন্দিরের চক্র দেখতে পাবে এবং এখানেই তোমার জন্য নিত্য প্রসাদ আসবে। পুরীতে যতদিন চৈতন্য ছিলেন —প্রতিদিনই তাঁর এই নীরব ভক্তটিকে তিনি দর্শন দিয়ে গেছেন। এমন ভক্তাধীন প্রভু জগতে দুর্লভ।

প্রতাপরুদ্র ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠেছেন চৈতন্য মিলনের জন্য। শেষ অবধি নিত্যানন্দকে অগ্রবর্তী করে সার্বভৌম প্রভৃতি চৈতন্যের কাছে প্রতাপরুদ্রের হয়ে শেষ বিনীত অনুরোধ জানাতে গেলেন।

নিত্যানন্দ ভয়ে ভয়ে প্রতাপরুদ্রের আগ্রহের কথা জানালেন। চৈতন্যের মন নরম হল শুনে। কিন্তু বাইরে কপটরোষে বললেন—লোকে যে-কাজে নিন্দা করবে, সে কাজ আমি কি করে করব। এই যে স্বরূপ দামোদর সে পর্যন্ত আমাকে ভর্ৎসনা করবে। তবে 'দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে।'

দামোদর অপ্রস্তুতে পড়ে বললেন—তোমার সিদ্ধান্ত আমি বলি কেমন করে। তবে নিশ্চয়ই প্রতাপরুদ্র একদিন করুণা পাবেন।

নিত্যানন্দ বললেন, একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত এক্ষেত্রে। তুমি এক কাজ কর। তাকে 'এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি' তবে তার প্রাণ বাঁচে।

এই বলে চৈতন্যের সম্মতি অনুসারে একটি বহির্বাস (কৌপীনের উপর পরিধেয় গেরুয়া কাপড়) নিত্যানন্দ চেয়ে নিয়ে সার্বভৌমের মাধ্যমে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা সেটি পেয়ে তার পুজা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর চৈতন্যমিলনাকাঙ্ক্ষা কমল না। বরং বেড়ে গেল। আবার রামানন্দ মাধ্যমে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন।

চৈতন্য শেষে বাধ্য হয়ে বললেন—রাজদর্শন আমি করব না। সে বড় দোষের—সাদা কাপড়ে কালো কালির দাগের মতো। যাই হোক তাঁর পুত্রকে নিয়ে এসো—পিতা-পুত্রে তফাৎ নেই—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'।

সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন ॥—তাকে নিয়ে আসা হল। তাকে দেখে চৈতন্যের 'কৃষ্ণ-স্মৃতি' হল। মহাপ্রভু তাকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিলেন। পুত্র ফিরে গেলে তাকে বুকে নিয়ে রাজা যেন চৈতন্যকে আলিঙ্গনের সুখ পেলেন।

এই মত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥

প্রথমেই চৈতন্য কাশী মিশ্র, পড়িছা আর সার্বভৌমকে ডেকে নিয়ে মন্দির মার্জনের ব্যবস্থা করলেন। বার বার ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে মন্দিরের সব জায়গা পরিষ্কার করে দিলেন। সে যেন একটা উৎসব। ঘর-মন্দির পরিষ্কার হয় আর চলে উদাত্ত হরিনাম।

শেষে রথযাত্রা আরম্ভ হল 'জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন।' রথের আগে আগে নাচতে নাচতে চললেন ভক্তগণ সঙ্গে চৈতন্য। ভক্তিতে তিনি প্রায়শই মূর্ছিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়েছেন সে দৃশ্য দেখতে।

রথাগ্রে নর্তন করেন শ্রী শচীনন্দন।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দরশন॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।

ক্রমে রথ এসে গুণ্ডিচা ঘরের সামনে দাঁড়াল। চৈতন্য সকলকে ছেড়ে কাশী মিশ্রের সেই নির্জন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখছিলেন চৈতন্যকে। এবার সুযোগ এসে উপস্থিত। রাজবেশ ত্যাগ করে দীনবেশে তিনি সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন গৃহপিণ্ডায়—ঘরের বারান্দায় মহাপ্রভু পড়ে আছেন। অমনি শুরু করলেন 'জয়তি তেংধিকং' ইত্যাদি রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক। চৈতন্য সে শ্লোক শুনে উঠে প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন দিলেন।

প্রভু কহে-কে তুমি করিলে মোরে হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥

রাজার নিষ্ঠা ও ধৈর্য জয়লাভ করল। চৈতন্যের অনুগ্রহে তিনি ধন্য হলেন। প্রতাপরুদ্র শিষ্যত্ব পেলেন। দুপুরে প্রভু বিশাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সকলে আনন্দ করে খেলেন।

এইভাবে প্রায় চারমাস ধরে আনন্দোৎসবের পর প্রভু সকলকে একদিন তাঁর গুণ্ডিচা ঘরে সমবেত হতে বললেন। সেইমত সকলে এলে তিনি অদ্বৈত আচার্যকে আচণ্ডালে ভক্তিদান এবং নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে গিয়ে 'অনর্গল প্রেমভক্তি' প্রচারের আদেশ দিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডেকে একটি বস্ত্র দিয়ে শচীমাকে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন। মায়ের কথা বলতে বলতে সন্ন্যাসী চৈতন্যের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

তারপর রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্তকে সম্মান জানালেন। শিবানন্দকে বললেন—

প্রতি বর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আনিবে সবারে পালন করিয়া।

সত্যরাজ খান, মুকুন্দ দাস, রঘুনন্দন, নরহরি দাস, সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, মুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি ভক্তকে যথোচিত বিনয় প্রকাশ করে বিদায় দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সবাই কাঁদতে শুরু করলেন বিচ্ছেদ বেদনায়।

সার্বভৌম, এঁরা চলে গেলে, একদিন চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। চৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। সার্বভৌমের স্ত্রী 'ষাঠীর মাতা' প্রচুর রান্না করে খাওয়ালেন।

এদিকে নিত্যানন্দ চৈতন্যের আদেশে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই গৌড়দেশে এসেছেন।

নিত্যানন্দ এসে গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রামে উঠলেন। এগ্রামের রাঘব পণ্ডিত তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি সেখানেই উঠলেন। তাঁর কীর্ত্তন শুনে আশেপাশের ভক্তগণ এসে দলে দলে হাজির হতে লাগলেন। পানিহাটীকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করে নিত্যানন্দ এলেন এবার খড়দহে। এটিই গৌড়দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল।

খড়দহ থেকে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীমায়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানালেন। সেখানে এবং আশপাশের অঞ্চলে তিনি হরিনাম প্রচার করতে থাকলেন। সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত এই প্রচারে খুব আনুকূল্য

করলেন।

এই খড়দহে থাকতে থাকতেই চৈতন্যদেবের প্রয়াণের পর তিনি (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) এক সঙ্গে দুই বোন জাহ্নবা ও বসুধাকে বিবাহ করে সংসারী হয়ে ওঠেন। লক্ষ্য করার ব্যাপার, চৈতন্যের জীবৎকালে তিনি একাজ করতে সাহসী হননি। শুধু বিবাহ নয়, গৃহীর সাজসজ্জাও করতেন। কিন্তু নিজের বিনীত স্বভাব ত্যাগ করেননি কখনও।

ফলত, নিত্যানন্দ ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের একজন প্রধান পুরুষ। সে কারণেই বাংলাদেশে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের নাম একই সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

২৩

বছর দুয়েক নীলাচলে থাকার পর 'প্রভুর ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন'। প্রতাপরুদ্র শুনে বিষণ্ণ হয়ে সার্বভৌম আর রামানন্দকে ডেকে বললেন যাতে প্রভু নীলাচল ছেড়ে অন্যত্র না যান, তাঁর যত্ন নাও।

তাঁরা গিয়ে চৈতন্যকে সেইমত বললেন—রথ আসুক আবার, রথ দেখুন। কার্তিক মাসে যাবেন। কার্তিক এলে বললেন—মহাশীত আসছে, দোলযাত্রা দেখে যাবেন। এমনি করে দুবছর গেল। তৃতীয় বছরে আবার গৌড়ের ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখতে নীলাচলে এলেন। এবার ভক্তগণের সঙ্গে নারীরাও এলেন। শিবানন্দ সেন সকলকে যত্ন-ভরে নিয়ে এলেন।

আবার রথ এল। আবার গুণ্ডিচাগৃহ সম্মার্জন হল।

পঞ্চম বৎসরে চৈতন্য তার কোন আপত্তি বাধা মানতে চাইলেন না। 'এবার আমি যাবোই বৃন্দাবনে—যাবার সময় গৌড় দেশ হয়ে যাবো, মা আছেন, গঙ্গা আছেন, দেখে যাবো যাবার পথে।'

এবার রামানন্দরা ভাবলেন, আর বেশি চালাকি ভাল নয়। বর্ষার কটি মাস কাটিয়ে বিজয়াদশমীর দিনে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন। 'উড়িয়া ভক্তগণ' সঙ্গ নিলেন—অনেক কষ্টে তাঁদের নিষেধ করলেন। তারপর নিজের লোকদের নিয়ে প্রথমে ভবানীপুর ও পরে ভুবনেশ্বরে এলেন। কটকে দেখা হল প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে। প্রতাপ-

রুদ্রকে কৃপা করে, ‘প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা’ নাম হল চৈতন্যের। প্রতাপ-রুদ্রের ব্যবস্থাপনায় চৈতন্যের যাত্রাপথে নানা সুব্যবস্থা গৃহীত হল।

নতুন একটি নৌকায় চড়ে মহাপ্রভু নদীপার হলেন। সেখানে রাজমহিষীরা এসে দূর থেকে তাঁকে দর্শন করলেন।

নীলাচল থেকে চৈতন্যের সঙ্গে রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, সার্ব-ভৌম প্রভৃতিরা এসেছিলেন। প্রভু গদাধরকে নীলাচল ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন—কারণ গদাধর ‘ক্ষেত্র সন্ন্যাস, নিয়েছিলেন—অতএব তাঁর ‘ক্ষেত্র’ ত্যাগ করা উচিত নয়। গদাধর বললেন—তোমার সঙ্গে আমি যাবো। তাতে ‘ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর রসাতলে’ যাক।

গদাধর রাজী না হয়ে একলাই আলাদাভাবে যেতে আরম্ভ করলেন। শেষে প্রভু আবার ডাকিয়ে বোঝাতে চাইলেন। গদাধর গোঁ ছাড়েন না। অবশেষে মহাপ্রভু নৌকা চড়ে প্রায় পালিয়ে গেলেন।

তখন মূর্ছিত গদাধরকে নিয়ে সার্বভৌম কোনপ্রকারে নীলাচলে ফিরে এলেন। প্রবল কষ্টের সঙ্গে ফিরে এলেন রামানন্দও। ক্রমে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে পিছলদা গ্রামে পেঁাছলেন চৈতন্য। এমনিতে সেখানে দারুণ দস্যুভয়—ওপারেই পাঠানদের রাজ্য। কিন্তু সেখানে অধিকারী চৈতন্যকে দেখে বিমোহিত হল, ‘সন্ধির’ প্রস্তাব পাঠালেন উড়িষ্যা সীমান্তের অধিকারীকে। তিনি অনুমতি পেয়ে চৈতন্য দর্শন করে গেলেন একেবারে নিরস্ত্র হয়ে।

তারপর মুকুন্দ দত্তের প্রস্তাব ক্রমে তিনি চৈতন্যকে নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রমের ব্যবস্থা করে দিলেন। মহাপ্রভু তাঁর ব্যবস্থাপনায় কঠিন প্রহরার মধ্যে মন্ত্রেশ্বর নদী পার হলেন এবং বরাবর এসে পাণিহাটী এলেন। সেখানে ‘রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেল।’ একদিন সেখানে থেকে সকালে কুমার হট্টে গিয়ে শ্রীনিবাস, শিবানন্দ, বাসুদেব, মাধব দাস প্রভৃতির গৃহে সাতদিন থাকলেন। এবার এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে। এখানে দেখা হল আবার দুঃখিনী শচীমাতার সঙ্গে—‘শচী মাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা।’ রামকেলি গেলেন এর পর। ফিরে শান্তিপুরে দশদিন থাকলেন। যেখানেই যান, সেখানেই

লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড়। কুলিয়াগ্রামে তাঁকে দেখবার জন্য মেলা বসে যায়। লক্ষ লোক চৈতন্যের সঙ্গে বৃন্দাবন যেতে চান।

রামকেলিতে চৈতন্য এলে গৌড় বাদশাহ হুসেন শাহ পর্যন্ত চৈতন্যের পরিচয় জানতে উৎসুক হন। কেশব ছত্রী পাছে মুসলমান রাজার হাতে চৈতন্যের ক্ষতি হয় ভেবে মিথ্যা করে বললেন—ও কিছু নয়, সামান্য একজন সন্ন্যাসী মাত্র। পরে হুসেন শাহ তাঁর খাস কর্মচারীদের কাছে সব জানলেন। এই কর্মচারী দুটির উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' ও 'দবীর খাস'। আসল নাম সনাতন এবং রূপ। 'রাজ মন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি'—জন্ম ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। ছোট ভাই রূপ তাঁর চেয়ে দু'বছরের ছোট।

চৈতন্যের কাছে দুই ভাই দুপুর রাতে বেশ লুকিয়ে গোপনে এসে দেখা করে গেলেন যাতে হুসেন শাহ না জানতে পারেন। তখন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ দুজনেই তাঁর কাছে। নিজেদের পরিচয় দিলেন এই বলে—

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, সবি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গো-ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥

মুসলমান রাজার কাছে চাকরি করতেন বলে হিন্দু হয়েও স্পর্শ-দোষে তাঁরা নিজেদের এরকম হীন ভাবতেন।

চৈতন্য শুনে তাঁদের নাম দিলেন রূপ-সনাতন। চৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের কিছু আগে থেকেই চিঠিপত্র চলেছিল বলে মনে হয়। যাইহোক চৈতন্য তাঁদের ক্ষমা করলেন। চলে যাবার আগে দুজনে তাঁকে বললেন—

ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
(আর) তীর্থ যাত্রায় এত লোকের সংঘট্ট 'ভাল নহে রীতি ॥'
যাঁহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি ॥

এই শুনে 'নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা'—এযাত্রা চৈতন্যের বৃন্দাবন যাওয়া হল না—সনাতনদের পরামর্শ ভাল মনে হল তাঁর। এখন নীলাচলে যাওয়াই ভাল। পরে একা যাবেন বলে মনে মনে ভাবলেন। আরও মনে হল—

গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবনে যাইতে নারিল ॥

ফিরে এলে সেই গদাধর বললেন—এখন বর্ষাকাল, ফিরে এসেছেন খুব ভাল হয়েছে। মাস চার পরে যাবেন আবার।

২৪

ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত হল। এবার চৈতন্য বৃন্দাবনে যাবেন বলে সংকল্প করলেন। রামানন্দ স্বরূপের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন একদম একা যাবেন এবং 'রাত্র্যে উঠে বনপথে পলাইয়া যাব।'

তাঁরা বললেন তাই যাবেন, কিন্তু একটি মাত্র অনুরোধ, সঙ্গে একজন 'উত্তম ব্রাহ্মণ' নিয়ে যান। তিনি হলেন বলভদ্র আচার্য। তাঁর সঙ্গে একজন 'বিপ্রভৃত্য'ও আছেন। এই তিনজনে আপনারা যান।

চৈতন্য রাজী হলেন। এবং 'শেষ রাত্র্যে উঠি প্রভু চলিলা লুকা-ইঞা।' অপরিচিত পথে তিনি কটক শহরকে ডাইনে ফেলে বনপথে চলতে লাগলেন। প্রথমে এলেন ঝারিখণ্ডে (সম্ভবত বর্তমান ঢেঙ্কানল, কেওনঝোর অঞ্চল)। বহু লোক সেখানে তাঁকে দেখতে এলেন। সেখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে তিনি ছোটনাগপুর ও বিহারের মধ্য দিয়ে কাশীতে এলেন। দুপুর বেলায় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করছেন, এমন সময় দেখলেন সেখানে তপন মিশ্র, যাকে তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় অনুশিষ্ট ভক্ত করে কাশীতে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। খুব আনন্দ হল তাঁর। তপন মিশ্রের সখা চন্দ্রশেখর, চৈতন্যের পূর্বাবধি ভক্তের সঙ্গেও দেখা হল। বেশ কদিন তপন মিশ্রের আতিথ্য স্বীকার কালে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ঘটল ভক্তিধর্মে অবিশ্বাসী সন্ন্যাসী-পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে।

শিষ্যমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা শুনে অবজ্ঞাভরে প্রকাশানন্দ বললেন-

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবকগণ লইয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥

আমি জানি সন্ন্যাসী সে নামে মাত্র, আসলে মস্ত যাদুকর। যাইহোক, কাশীতে ও-সব চালাকি খাটবে না। খবরদার, তোমরা ওর কাছে যেও না। বরং ভাল ক'রে বেদান্ত পড়, বেদান্ত শোন।

কথাগুলো চৈতন্যের কানে গেলে হেসে ঠাট্টা করে বললেন—যাদু-বিদ্যা ('ভাবকালি') বিক্রি করার জন্যে তো কাশী এলাম। কিন্তু খদ্দের না পেয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে।

পরের দিন সকালে গৌরহরি মথুরা রওনা হলেন। পথে প্রয়াগে স্নান করলেন। তিনি দিন প্রয়াগে থেকে আবার মথুরার পথ ধরলেন। যেতে যেতে বহু মানুষকে বৈষ্ণবধর্মের সারকথা শুনিয়ে গেলেন। যমুনা দেখে পাগল হলেন।

মথুরাতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে আলাপ হল মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ্যের সঙ্গে এবং তাঁর আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই শিষ্য ছিলেন সনোরিয়া শ্রেণীর 'হীন' ব্রাহ্মণ—প্রভু সানন্দে তাঁর রান্না খেলেন।

এখানেও প্রচুর লোক আসতে শুরু করলো। প্রভু সর্বদা ভিড় এড়াতে চান। আর সেই ভিড় সর্বদা তাঁকে তাড়না করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই কোনোক্রমে সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বৃন্দা-বনের পথে গেলেন। নীলাচলে চৈতন্যের আর্তি যে পরিমাণে ছিল—মথুরা-বৃন্দাবনে এসে তা লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পেল। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রেমোন্মাদে দ্বাদশ বন পরিভ্রমণ করলেন। কৃষ্ণস্মৃতিতে তিনি পূর্ণমগ্ন। বৃন্দাবন তখন লুপ্ততীর্থ। বস্তুত বৃন্দাবনের মহিমার যেন অনেক খর্ব হয়ে গেছিল। চৈতন্য ভাবাবিষ্ট হয়ে সমস্ত লুপ্ততীর্থ নির্দেশ করলে বৃন্দা-বনের লুপ্ত সম্মান আবার ফিরে আসে।

বৃন্দাবনে প্রেমধর্ম প্রচার চৈতন্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখানের

রাজপুতশিষ্য কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী এই বৈষ্ণবধর্ম পরে গুজরাট-সিন্ধু অঞ্চলে প্রচার করেন। মথুরা-বৃন্দাবনেও তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত জুটল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চৈতন্যের দিন কাটতে লাগল। সনোরিয়া ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে গেলেন, চৈতন্যের জীবন সংশয় বলে তাঁর মনে হতে লাগল। অবশ্য সঙ্গে আছেন সেই বলভদ্র ভট্টাচার্য। দুজনে মিলে চৈতন্যকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরামর্শ করলেন এবং মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে প্রয়াগে নিয়ে আসলেন।

'যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন' তবুও ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করার জন্য রাজী হলেন। পথে বেশ বিপদ উপস্থিত হল। মহাপ্রভুর সঙ্গে তখন পাঁচজন ভক্ত। চৈতন্য প্রেমে এক বৃক্ষতলে মূর্ছিত। হঠাৎ সে পথে দশজন পাঠান সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তারা ভাবল এই সন্ন্যাসীকে বোধ হয় এই পাঁচজন লোক মেরে ফেলেছে। অমনি তারা 'পঞ্চজনেরে বান্ধিল'। তখন রাজপুত কৃষ্ণদাস বললেন—না না, এই সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছারোগ আছে। চল, তোমাদের বাদশার কাছে নিয়ে চল।

পাঠানেরা বিশ্বাস করে না। তখন ভয় দেখাবার জন্যে কৃষ্ণদাস বললেন— আমার ঘর এই গ্রামে।

শতেক তুরুক আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লৈবে তোমা সবা মারি॥

এমন সময় চৈতন্যের জ্ঞান ফিরল এবং সব কথা শুনে বললেন, তোমরা ভুল করছ, ওরা চোর-জোচ্চোর নয়, আমার সঙ্গী। তোমরা ছেড়ে দাও ওদেরকে। আমার মৃগী ব্যাধি আছে, তাতেই অচেতন হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে, তখন 'এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন।' কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, পাঠান দলের জনৈক পীর চৈতন্যের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে শেষে 'মহাপ্রভুর চরণে' পড়েন এবং প্রভু তাঁর 'রামদাস' নাম দিয়ে তাঁকে ভক্ত শ্রেণীভুক্ত করেন। এমনি রাজপুত্র অল্পবয়সী বিজুলী খানও মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হন।

সেখান থেকে চৈতন্য এলেন 'সোরোক্ষেত্র' বা সৌরক্ষেত্র এবং স্নানান্তে প্রয়াগের দিকে এগোতে লাগলেন। ক্রমে তিনি প্রয়াগে এলেন এবং 'দশদিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা'।

২৫

রূপ সনাতনকে রামকেলি গ্রামে রেখে চলে এসেছিলেন। এখন রূপ এসে এই প্রয়াগেই মিলিত হলেন চৈতন্যের সঙ্গে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তাঁদের জীবনে।

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা-বৃন্দাবন দেখে নীলাচলে ফিরছেন চৈতন্য, রূপ ছোট ভাই অনুপমকে (বল্লভ) সঙ্গে নিয়ে গৌড় থেকে প্রয়াগে এলেন। গৌড় ছাড়ার সময় অনেক টাকা পয়সা নিয়ে আসেন এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে অর্ধেক ও সিকি টাকা আত্মীয় কুটুম্বকে দিয়ে দশ হাজার টাকা সনাতনকে দিয়ে এলেন।

এর মধ্যে লোক পাঠিয়ে রূপ খবর আনিয়েছেন—চৈতন্য বৃন্দাবনে গেছেন। অমনি দাদাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনিও বৃন্দাবন যাচ্ছেন ছোট ভাইকে নিয়ে। তুমিও এসো।

এদিকে চৈতন্য প্রয়াগে বিন্দুমাধব দর্শন করে এক পূর্ব পরিচিত দক্ষিণী ব্রাহ্মণের ঘরে একলা বসে আছেন, এমন সময় 'শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা'। তাঁদের দেখে চৈতন্য বড়ো খুশি হলেন এবং রূপকে কাছে বসিয়ে সনাতনের সংবাদ নিলেন।

রূপ বললেন, তিনি তো রাজগৃহে বন্দীজীবন যাপন করছেন। চৈতন্য বললেন—আমার মনে হচ্ছে, সে শিগ্‌গিরই আসছে, তার বন্ধন দশা মোচন হয়েছে।

রূপ নিকটেই একটি বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলেন ভাইকে নিয়ে। চৈতন্য তাঁকে দশদিন ধরে শিক্ষা দিয়ে রসগ্রন্থ রচনার আদেশ দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের যাবতীয় শিক্ষা চৈতন্যদেবের কাছে জেনে নিয়ে রূপ দীনতাসহ বৃন্দাবনে গেলেন। এই হল চৈতন্যের সঙ্গে রূপের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার।

এবারে চৈতন্যের বারাণসী যাবার ইচ্ছে হল। রূপ সঙ্গী হতে চে-
ছিলেন, চৈতন্য তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে ব'লে, বলে গেলেন যে,

বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥

যাবার আগে চৈতন্য প্রখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভাগবতের টীকাকা
বল্লভ ভট্টের সঙ্গে পরিচিত হন ও রূপ-বল্লভসহ তাঁর আতিথ্য স্বীকা
করে যান।

বৃন্দাবন ত্যাগ করে কাশীতে এসে প্রভু পূর্বপরিচিত চন্দ্রশেখরে
বাড়িতে এলেন। তপন মিশ্রও এলেন। চন্দ্রশেখর বললেন,—প্রভু যে
কয়টি দিন কাশীতে আছেন, আমার ঘরে ছাড়া অন্য কোথাও নিমন্ত্র
স্বীকার করবেন না। চৈতন্য রাজী হলেন। এখানে এসে সেই মহা
রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মিলিত হলেন। অনেক বিখ্যাত ভদ্র মানুষেরা চৈতন্যে
সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন।

এদিকে সনাতন গোস্বামী মনে মনে ভাবছেন, কি করে হুসেন
শাহের বিরাগভাজন হয়ে চলে গিয়ে চৈতন্য মিলন সম্ভব হয়। শরীরের
দোহাই দিয়ে ঘরে বসে শাস্ত্রালোচনা করতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ
বাদশা এসে তাঁর ঘরে হাজির। দেখে বুঝতে পারলেন সনাতন ইচ্ছে
করে রাজকার্যে যাচ্ছেন না। খুব রেগে বললেন—তোমার তো অসুখ
বিসুখ কিছু নেই। ঘরে বসে আছ, আর সমস্ত কাজ নষ্ট হচ্ছে আমার
সনাতন বললেন, আমাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না, তুমি অন্য
লোক দেখ।

বাদশা রেগে অগ্নিশর্মা হলেন এবং সনাতনকে বন্দী করলেন—
'তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন'। কারণ রূপ আগেই পালিয়ে-
ছেন, এবারে সনাতনও যদি পালান।

সনাতন তো কারাগারে আছেন, এমন সময় রূপের চিঠি এল।
ঠিক করলেন, পালাতে হবে যে-কোনো উপায়ে। কারাগারের প্রহরীকে
'জিন্দাপীর' সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে ছেড়ে দিতে বললেন।
প্রহরী বললো—আমি মরি আর কি! পাঁচহাজার টাকা দিচ্ছ,

কিন্তু আমার তো জানের ভয় আছে।

সনাতন বললেন—তুমি তো জানো উড়িষ্যা সীমান্তে বাদশা যুদ্ধ করতে গেছেন, এখানে নেই। ফিরে যদি আসেন, বলবে শৌচ করতে গিয়ে সনাতন পালিয়েছে। আর তুমি জেনে রাখো—আমাকে ছেড়ে দিলে আমি এদেশেই থাকবো না, 'দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'।

এই বলে সনাতন সাত হাজার টাকা (এই টাকা রূপ রেখে গেছিলেন) আনিয়ে রক্ষীর সামনে রাখলেন। 'লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া'। সনাতনকে সে মুক্ত করে দিল। সনাতনের পায়ের বেড়ি সে কেটে দিল এবং তাঁকে গঙ্গাপার করে দিল।

রাতদিন চলে সনাতন পাতড়া পর্বতে এসে হাজির হলেন। গৌড় থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রশস্ত 'গাড়ীদ্বার পথে' তিনি না এসে বনপর্বত ভেঙে এলেন। মনে হয় জেলে থাকায় তাঁর দাড়ি গোঁপ গজিয়েছিল—মুসলমান দরবেশের ছদ্মবেশে চলেছিলেন। চলেছিলেন মক্কায় নয়, কাশীর পথে। মন্ত্রীর এখন 'হাতে করোয়া ছিঁড়া কান্থা'।

এবারে এলেন হাজিপুরে, দেখা হল হুসেন শাহের কর্মচারী ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলেন এবং শেষে কাশী পৌঁছলেন। কাশীতে প্রায় দু'মাস ধরে থাকলেন।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে প্রভু আছেন। এমন সময় বাইরের দরজায় সনাতন পৌঁছলেন। প্রভু বললেন, দেখতো চন্দ্রশেখর বাইরের দরজায় একজন বৈষ্ণব এসেছেন। চন্দ্রশেখর দেখে এসে বললেন, কোনো বৈষ্ণব তো নেই কেবল 'এক দরবেশ আছে দ্বারে'।

প্রভু বললেন ঐ দরবেশকেই নিয়ে এস। তাঁকে নিয়ে আসা হলেই তিনি সনাতনকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরে নিজের পাশে পিঁড়ের উপর বসালেন। সনাতন খুব কুণ্ঠিত। কারণ তিনি 'ম্লেচ্ছ-জাতি'। প্রভু বললেন, তোমাকে স্পর্শ করে আমি শুদ্ধ হই, আর তুমি বলছ ম্লেচ্ছ? 'ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।'

চৈতন্য সনাতনের বেশ পরিবর্তন করালেন। দাড়ি-গোঁপও কামানার ব্যবস্থা করে দিলেন। চন্দ্রশেখর অন্তর্বাস বহির্বাস এনে দিলেন।

তারপর সনাতনকে কাছে রেখে দিনের পর দিন শিক্ষা দিতে লাগলেন। সে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অনুসারী। শিক্ষার বোধ একেবারে ফলবতী হয়ে চৈতন্যের দেহমনে প্রকট। যেন সনাতনকে শিক্ষা দেবার জন্যেই তিনি কাশীতে রয়েছেন। রূপগোস্বামীকে তিনি রসশাস্ত্রের নানা শিক্ষা দিয়েছেন। সনাতনকে দিলেন 'ভক্তির সিদ্ধান্ত'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

সনাতন কৃপায় পেনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পেনু রসভাব প্রান্ত॥

সে সব অনেক গূঢ় তত্ত্বের কথা। সে সব দার্শনিক-রসিকেরা বুঝবেন। সনাতনের শিক্ষা ও দীক্ষা সমাপ্ত হল। চৈতন্য তখন তাঁকে কতকগুলি কাজের ভার দিলেন। বললেন, তুমি ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর, মথুরায় লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার কর, বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কর। আদেশ মতো কাজের ভার নিয়ে সনাতন মথুরা রওনা হলেন।

মহাপ্রভুর আদেশানুসারে রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যেতেন না, কেবল একবার মাত্র নীলাচলে গেছিলেন চৈতন্যকে দেখতে। রূপ সনাতনের জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম সর্বভারতীয় প্রচার পেল নতুন করে। তাঁদের জন্যই চৈতন্যের জীবন কাহিনীমাত্র না হয়ে জীবনী হল, ভগবত্তা পেল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন রচিত হল।

কাশীবাসকালে চৈতন্য দুটি বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ঘটনাক্রমে। এর ফলে চৈতন্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুগুণে যেমন বেড়ে গেল—তেমনি ভক্ত পণ্ডিত ও মানুষ চৈতন্যের পরিচয় পুনশ্চ পাওয়া গেল।

চৈতন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নাচ-গান-কীর্তন করেন —কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এজন্য যখন তখন তাঁকে নিয়ে নিন্দাবাদ করা হয়। সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ চৈতন্যের নিন্দা শুনে খুবই বিচলিত হন এবং এর প্রতিকারে ব্যবস্থা সন্ধান করতে থাকেন। শেষে ঠিক করেন চৈতন্যসমেত সমস্ত সন্ন্যাসীকে একত্রিত করে এর একটা বিহিত করবেন।

চৈতন্যকে এসে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। চৈতন্য তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং গিয়ে দেখলেন—প্রচুর সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটেছে এবং তাঁরা পঞ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যান করছেন।

চৈতন্য সকল সন্ন্যাসীকে সম্মান জানিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসলেন দেখে সন্ন্যাসীগণ হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আসলে প্রকাশানন্দ চৈতন্যকে ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ব'লে যে হীন মনে করতেন, বিনয়ের সঙ্গে চৈতন্য তার প্রতিবাদ করলেন। য'ইহোক প্রকাশানন্দ নিজে এসে হাত ধরে চৈতন্যকে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী-সভার মাঝখানে বসালেন এবং কেন চৈতন্য কৃষ্ণনাম করে নাচ গান করেন তা নিয়ে অনুযোগ করলেন।

চৈতন্য বললেন কৃষ্ণনাম ভজনেই তাঁর উদ্ধার ঘটবে, বেদান্ত পঠনে নয়। তাঁর গুরু তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তখন তর্ক শুরু হল। আমরা আবার সেই পূর্বের তার্কিক নিমাই পণ্ডিতকে দেখলাম, দেখ-লাম যেন নতুন করে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে তিনি তর্কে লিপ্ত হয়ে-ছেন। এখানেও আবার জ্ঞানমার্গ খণ্ডন করে ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন। প্রকাশানন্দ-বিজয় সম্পূর্ণ হল। প্রকাশানন্দ আত্মসমর্পণ করলেন। শুধু তাই নয়, একদিন সপারিষদ কীর্তনে যোগ দিয়ে নৃত্য পর্যন্ত করলেন।

এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্তন ॥

কাশীতে শেষ পর্যন্ত তাঁর 'ভাবকালি' ভালই বিক্রি হল। কিন্তু সর্বদা এতো লোকের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে না। সেজন্য কাশী ত্যাগ করার সংকল্প নিলেন।

যাবার আগে সুবুদ্ধি রায়কে চিন্তামুক্ত করে তাঁকে আধ্যাত্মিক সুস্থিরতার পথে এগিয়ে দিলেন। সুবুদ্ধি রায় একদা গৌড়ের 'অধি-কারী' ছিলেন। সেসময়ে তিনি হুসেন শাহার কোন দোষ দেখে 'তারে চাবুক মারিল'। ঘটনাক্রমে সেই 'হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল'। তখন

হুসেন খাঁর স্ত্রী স্বামীর অপমানের শোধ নেবার জন্য সর্বদা স্বামীকে প্ররোচনা দিতে লাগলেন। শেষ অবধি সুবুদ্ধির জাত নেবার জন্য হুসেন খাঁ তাঁর মুখে 'কারোয়ার পানি' (বদনার জল) ঢেলে দিলেন। সুবুদ্ধি রায় জাতিভ্রষ্ট হলেন।

এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সুবুদ্ধি ছুটে বেড়াতে লাগলেন। পণ্ডিতে বললেন 'তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে'। শেষ অবধি কাশীতে মহাপ্রভু এসেছেন শুনে তাঁর শরণ নিলেন। মথুরার ধ্রুবঘাটে তিনি রূপ গোস্বামীর কাছে চৈতন্যের কাশীতে আগমনের কথা শুনেছিলেন সুবুদ্ধি রায় তাঁকে সব কথা বললে—

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাইবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

এদিকে চৈতন্য নীলাচলে যেতে চেয়েছেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মারাঠী ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ প্রভৃতিরাও যেতে চাইলেন সঙ্গে।

চৈতন্য বললেন—না। আমি ঝারিখণ্ডের পথে একা যাবো। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তোমরা পরে এসো নীলাচলে। আর সনাতনকে বললেন—তুমি বৃন্দাবনে যাও, তোমার দুভাই সেখানে আগেই গিয়েছে। সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন।

২৬

চৈতন্য নির্জন বনপথ দিয়ে মহানন্দে এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে অবশ্য বলভদ্র ভট্টাচার্য আছেন। আঠার নালায় এসে তিনি ভক্তবর্গকে তাঁর আসার খবর জানিয়ে দিলেন। সে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই যে নীলাচলে এলেন, আর সে স্থান ছেড়ে কোথাও গেলেন না। আমৃত্যু আঠারো বছর ধরে নীলাচলেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হল। 'শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।'

প্রভু এসেছেন শুনে ভক্তবৃন্দ এলেন সানন্দে। এলেন স্বরূপদামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশী মিশ্র, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, প্রদ্যুম্নমিত্র, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর আর শঙ্কর পণ্ডিত। সকলে মিলে চৈতন্যকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে এলেন। কতোদিন পর জগন্নাথ দর্শন করে প্রভুর আনন্দের অন্ত নেই।

চৈতন্য ফিরে এসেছেন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে—এই খবর স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলে সেখানেও আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। শচীমাতাও আনন্দিত হলেন। কুলীনগ্রাম আর শ্রীখণ্ডের লোকজন নবদ্বীপে হাজির হতে লাগলেন। 'সেখো' শিবানন্দ সকল ভক্ত নিয়ে নীলাচলে এলেন। আবার সেই আগের মতো আনন্দ করতে লাগলেন সবার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য।

এদিকে চৈতন্যের আদেশ বহন করে কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হয়েছেন বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনাদি। তাঁদের রচিত শাস্ত্র বৈষ্ণব ধর্মকে নতুন মহত্ত্ব এনে দিল। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা নাটক লিখতে আরম্ভ করে দিলেন বৃন্দাবনে। এখন তাঁর ইচ্ছে হ'ল নীলাচলে আসার। ভাই অনুপমকে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু 'গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্ত হইল।'

রূপ একাই এলেন এবং একনাগাড়ে দশমাস নীলাচলে থেকে গেলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের ওখানে উঠেছিলেন—সেখানেই চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হল।

চৈতন্য তাঁকে সনাতনের খবর জিগ্যেস করলেন। রূপ বললেন, অন্য পথে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

এই রূপই তাঁর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে চৈতন্যের অবতারত্ব লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। চৈতন্যের অপ্রকটের পর (বৈষ্ণবেরা মৃত্যু বলেন না) আরও ত্রিশ বছর রূপ বেঁচে থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ (যেমন, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি) রচনা করে গেছেন।

পুরুষোত্তমে ভগবান আচার্য নামে মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত ছিলেন।

'মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ।' 'একদিন আচার্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ'। অথচ ভাল চাল নেই ঘরে। তাই নিজে প্রভুর কীর্ত-নিয়া ছোট হরিদাসের কাছে এসে বললেন—

মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগিনী-স্থান গিয়া।
উত্তম চাল একমণ আনহ মাগিয়া॥

সেই বোনের নাম মাধবীদেবী—তিনিও চৈতন্যের অন্তরঙ্গজনের মধ্যে পড়তেন। স্ত্রীলোক বলে তাঁকে 'অর্দ্ধজন' ভাবা হত। (এটা খুব একটা ঠিক বলে মনে না হতে পারে এই স্ত্রীস্বাধীনতার যুগে।)

মহাপ্রভু খেতে বসে এতো ভাল চাল দেখে জিগ্যেস করলেন—'উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাহাতে পাইলা'। ভগবান আচার্য বললেন মাধবীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

—কে গিয়ে নিয়ে এল?

—ছোট হরিদাস।

শুনে চৈতন্য খেলেন মুখ বুজে। তারপরে বলে দিলেন—

আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা॥

ছোট হরিদাস শুনে দারুণ দুঃখ পেলেন—তিনদিন উপোস করে কাটিয়ে দিলেন। বুঝলেন না কি দোষে তাঁর এই শাস্তি।

চৈতন্য বললেন ছোট হরিদাস বৈরাগী হয়ে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করেছে—স্ত্রীলোকের কাছে গেছে, আমি ওর মুখ দেখবো না। এটা 'বিরক্ত সন্ন্যাসী' চৈতন্যের জীবনের একটি আশ্চর্য অসমন্বয়—অন্ততঃ আধুনিক দৃষ্টিতে।

'ধর্মত্যাগী মর্কটের মুখ' দেখবো না বলে তিনি রেগে চলে গেলেন। এমনকি স্বরূপ গোস্বামী পর্যন্ত যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করতে বললেন, তখনও চৈতন্য বললেন,—যাও, নিজের কাজে যাও। এমন কথা আবার যদি বল, তবে 'পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা'।

পরমানন্দপুরী একই অনুরোধ করলে চৈতন্য বললেন—আপনি সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে এখানে থাকুন। আমি আলালনাথে যাচ্ছি।

একমাত্র গোবিন্দ থাকবে। এই বলে গোবিন্দকে ডেকে যাবার উদ্যোগ করলেন। পরমানন্দ পুরী কোনোক্রমে প্রভুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

ছোট হরিদাস দূরে থেকে থেকে চৈতন্য-অনুগ্রহের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। এমনি করে এক বছর গেল। তবুও প্রসন্নতা নেই। তাই রাত্রি শেষে চৈতন্যকে দূর থেকে প্রণাম করে কাউকে কিছু না বলে প্রয়াগ চলে গেলেন এবং 'ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল'। ছোট হরিদাসের মৃত্যুসংবাদ শুনে চৈতন্য বলেছিলেন—'স্ব-কর্মফলভুক্'। ভক্তরা যা-ই ব্যাখ্যা দিন; সংযম শিক্ষার জন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন চৈতন্য-চরিতের প্রতিকূল। মাতৃ-দৃষ্টিতে স্ত্রীলোক দর্শন কি অপরাধ-যোগ্য? জানিনা।

বড়ো হরিদাস বা ঠাকুর হরিদাসও রয়েছেন এই নীলাচলেই। সমুদ্রতীরে নির্জন গুম্ফায় তিনলক্ষ হরিনাম প্রতিদিন জপ করে চলেছেন। কোনোদিন জগন্নাথ দেখতে যান না, চৈতন্যই তাঁকে প্রতিদিন দেখতে আসেন—তাঁর সচল জগন্নাথ দর্শন হয়ে যায়। চৈতন্যের সঙ্গে নানা মানবিক এবং আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

হরিদাস চৈতন্যের চেয়ে ছত্রিশ বছরের বড়ো ছিলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স হয় ৮০ বছর। একদিন চৈতন্য এসে দেখলেন—হরিদাস জপ করেই চলেছেন, খাবার পড়ে আছে। চৈতন্য বললেন—হরিদাস সুস্থ হও। হরিদাস উত্তর দিলেন—'শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি আর মন।' চৈতন্য বললেন—বয়স হল, এবার নাম জপ সংখ্যা কম কর, এবারে সংকীর্তন কর বেশি।

হরিদাস বললেন—তা পারবো না। তাছাড়া 'তোমার আগে আমি মৃত্যু ইচ্ছা করি।'

চৈতন্য বললেন—না না, ওকথা বলো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো তুমি। আমি একটি কীট মাত্র, মরে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না।

পরের দিন সকালে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্য হরিদাসের কাছে

এসে তাঁকে ঘিরে নাম সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। সকল ভক্ত হরিদাসের চরণ বন্দনা করলেন।

আর হরিদাস—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ পদ্মে দিলা ॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব ভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রমণ ॥

প্রেমে ভাবাবিষ্ট চৈতন্য হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নিয়ে উঠোনে নাচতে লাগলেন। এমন ইচ্ছামৃত্যু কজনের হয়! এ যে ভীষ্মের মৃত্যু। 'ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ'।

চৈতন্য এরপরে হরিদাস ঠাকুরের মরদেহ 'বিমানে' চড়িয়ে 'সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্তন করিয়া'। তিনি আগে আগে চলেছেন নৃত্য করতে করতে। পিছনে বক্রেশ্বর অন্য ভক্তদের সঙ্গে নাচছেন। হরিদাসের দেহ সমুদ্র জলে স্নান করিয়ে 'প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা।' তারপর গর্ত করে সেই দেহ শুইয়ে চৈতন্য নিজ হাতে 'বালু দিল গায়'।

তারপরে সমুদ্রে স্নান সেরে সিংহদ্বারে এসে নিজে আঁচল পেতে হরিদাসের মহোৎসবের জন্যে প্রসাদ ভিক্ষা চাইলেন। এর আগে কোনদিন নিজে আঁচল পেতে তিনি এমন করে ভিক্ষা করেন নি।

তারপর মহোৎসবের শেষে চৈতন্য ঘোষণা করলেন—যারা হরিদাসের শবানুগমন করেছিল, যারা এই মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করেছে 'অচিরে তা সভাকার হবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।'

নীলাচল থেকে রূপ গৌড়ে গেলেন আর সনাতন মথুরা থেকে এলেন নীলাচলে। ঝারিখণ্ডের পথে আসার সময় 'উপবাস' আর জলের

দোষে' সনাতনের গায়ে কণ্ডুরসা (দাদ !) হল এমন যে, সর্বদা তা থেকে রস পড়তে লাগলো। সনাতনের মনে হল একে নীচজাতি, তাতে এই রোগ—জগন্নাথ দর্শন তাঁর আর হবে না। অতএব সিদ্ধান্ত নিলেন—

জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥

এই ভেবে তিনি হরিদাস ঠাকুরের কাছে আশ্রয় নিলেন। চৈতন্য এখানে এসে তাঁকে দেখে সপ্রেমে আলিঙ্গন করতে গেলেন, অমনি সনাতন বললেন,—

মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়ি তোমার পায়।
একে নীচ অধম, তায় কণ্ডুরসা গায়॥

চৈতন্য জোর করে আলিঙ্গন করলেন। একটুও ঘৃণা করলেন না। শুধু তাই নয় সনাতনকে আত্মহত্যার পথ ত্যাগ করতে বললেন। তুমি আমার শিষ্য, তোমার দেহে আমার অধিকার। তুমি আত্মহত্যার অধিকার হারিয়েছ। তাছাড়া তুমি নিজেকে নীচ ভাবো কেন? এই বলে যে বাণী উচ্চারণ করলেন—সাম্প্রদায়িক প্রতিটি মানুষের সেই বাণী থেকে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন। তিনি বললেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাব।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দান করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

সনাতন হরিদাসের কুটিরে রয়ে গেলেন। একদিন চৈতন্য ভক্তগণের অনুরোধে যমেশ্বর টোটায় (বাগানবাড়ি) দুপুরের খাবার খেতে রাজি হলেন। সনাতনকেও খবর পাঠালেন যে, তিনিও এসে একসঙ্গে খাবেন। সনাতনের ভারি আনন্দ হল। কিন্তু মন্দিরের সামনে দিয়ে তিনি যাবেন না—তিনি তো 'অচ্ছুৎ'। অতএব সমুদ্রতীরের পথ ধরেই এগোতে লাগলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস। সূর্য অগ্নিবর্ষণ করছে, তীরের বালি

একেবারে আগুনের মতো। সনাতনের ভ্রূক্ষেপ নেই, গরম বালিতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে।

চৈতন্য বললেন, কেন তুমি মন্দিরের পথে না এসে পায়ে 'ব্রণ' করেছ? সনাতন বললেন তিনি দীন, 'সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার'। তাঁর বিনয়ে চৈতন্য তুষ্ট হলেন। আর বললেন—'তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ'। এই বলে চৈতন্য তাঁকে গভীর আলিঙ্গন করলেন—চৈতন্যের গায়ে 'কণ্ডুরসা' লাগল তবুও। এমন একাধিকবার আলিঙ্গন তিনি তাঁকে করেছিলেন।

একদিন জগদানন্দ আর সনাতন বসে আছেন। সনাতন দুঃখ করে ঘায়ের রস প্রভুর অঙ্গে লেগেছে বলে দীনতা প্রকাশ করলেন। জগদানন্দ তাঁকে বললেন—তোমার যোগ্য স্থান বৃন্দাবন, রাসযাত্রা দেখে সেখানে চলে যাও।

কথা প্রসঙ্গে চৈতন্যকে সেকথা নিবেদন করলে—চৈতন্য দারুণ রেগে গিয়ে জগদানন্দকে তিরস্কার করলেন—'বটে

কালিকার বড়ুয়া জগদা ঐছে গর্বী হৈল।
তোমা সবাইকে উপদেশ করিতে লাগিল॥ এবং

জানিয়ে দিলেন— 'জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হইতে।
মর্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥

তোমার গায়ে ঘা হয়েছে তাতে সন্ন্যাসীর কি? সন্ন্যাসীর কাছে 'চন্দন-পঙ্ক' একই। ভারি চমৎকার চৈতন্যের এই বাণী। তাই 'সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়।' সনাতন, তুমি দুঃখ ক'রো না— 'তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ।' এ বছরে তুমি আমার সঙ্গে থাকো, পরের বছর তোমাকে আমি বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেবো।

যাইহোক, দোলযাত্রা শেষ হলে বৃন্দাবনে তথা উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য পূর্বভারতের এই প্রচারক সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। দিতে অবশ্য তাঁর কষ্টই হল।

সনাতন বৃন্দাবনে এসে রূপের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বৈষ্ণব

গ্রন্থাদি রচনা করতে লাগলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃহৎ ভাগবতামৃত, হরিভক্তি বিলাস, বৈষ্ণব তোষণী বিখ্যাত।

চৈতন্যের টানে যাঁরা ঘর ছেড়ে এসে দীনাতিদীন জীবন বরণ করেছিলেন, সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাস তাঁদের অন্যতম। বাল্যকালে রঘুনাথ হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং 'বাল্যকাল হইতে তিঁহো বিষয়ে উদাস।' তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে বেঁধে রাখবার হাজারো চেষ্টা করেছেন। বিশাল ধনী লোকেন সন্তান তিনি। ধনের আকর্ষণ তাঁকে বাঁধতে পারে নি। এক সঙ্গে দুই সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী তিনি—তাঁদের বন্ধন তাঁকে বাঁধতে পারে নি। পিতা-মাতার অফুরন্ত স্নেহও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

গৌড় থেকে শান্তিপুরে এসে চৈতন্য যখন ছিলেন তখনই পিতার অনুমতিক্রমে রঘুনাথ চৈতন্যকে দেখতে এসেছিলেন। এবং আসার পর থেকেই তাঁর একমাত্র চিন্তা 'কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব।'

মথুরা থেকে চৈতন্য নীলাচলে ফিরছেন শুনেছেন। তারপর এক বছর গেল। এদিকে নিত্যানন্দ পানিহাটিতে এসেছেন শুনে রঘুনাথ তাঁকে দেখতে গেলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় তোরে আজি করিব দণ্ডন ॥

দণ্ড হল চিঁড়া দই-এর মহোৎসব। বৈষ্ণব ইতিহাসে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যাই হোক একদিন তিনি ফাঁক পেয়ে অ-পথে নীলাচলে এলেন—'পথে তিনদিন মাত্র করিল ভোজন'। চৈতন্য খুব খুশি। কিন্তু রঘুনাথ কৃশ হয়ে পড়েছেন দেখে সেবক গোবিন্দকে তাঁর অভিভাবক শিক্ষাগুরু করেছিলেন।

ধীরে ধীরে রঘুনাথ দীনতার জীবন বেছে নিলেন। আগে সিংহদ্বারে ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন, এখন ছত্রে গিয়ে চেয়ে খেতে

লাগলেন। কিছুদিন পরে তাও ছেড়ে দিলেন।

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়।

সেই টক হয়ে যাওয়া ভাত তিনি গাইগরুর সামনে ধরেন। গন্ধে গাই খেতে পারে না যখন, তখন সেই ভাত ঘরে এনে ধুয়ে ধুয়ে ভিত-রেতে যেটুকু 'দড় ভাত' পান, তাই তিনি নুন দিয়ে খেতে লাগলেন।

একদিন চৈতন্য স্বয়ং এসে রঘুনাথের খাবার থালা থেকে সেই গলিত খাবার মুখে নিয়ে বললেন, কী অপূর্ব খেতে—

প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই ॥

—এজন্যেই চৈতন্য ধন্য। আপনি আচার ধর্ম পরেরে শিখায়। ষোল বছর রঘুনাথ চৈতন্য চরণে আশ্রয় করেছিলেন। শেষের দিকে তাঁর কৃচ্ছ্রতা প্রবাদের স্থান গ্রহণ করেছিল—

আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ॥

২৭

বল্লভ ভট্ট ভাগবতের প্রখ্যাত টীকাকার। চৈতন্যের কাছে প্রায়ই আসেন সেই বৃন্দাবন থেকে প্রভুর ফিরে আসার পর থেকেই। নানা রকম আলোচনা করেন শাস্ত্র আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নিয়ে। অথচ একটা গোপন অহংকারও আছে। তাঁর মতো ভাগবতের টীকা আর কেউ রচনা করতে পারেন নি। এমনকি শ্রীধর স্বামীও না।

একদিন তো তিনি চৈতন্যসভায় বলেই বসলেন—এই দেখুন আমি ভাগবতের টীকা লিখেছি। এতে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি—'ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।'

চৈতন্য শুনে একটু পরিহাস করে বললেন—যে 'স্বামী'কে মানে না, সে ভ্রষ্টা। বল্লভের অহংকার চূর্ণ হল। পরে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে ক্ষমা করলেন।

এমনি করে পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই

রামচন্দ্রপুরীর নিন্দুক স্বভাবটির সংস্পর্শে এসে বড় দুঃখী হলেন। রামচন্দ্রপুরী পণ্ডিত কিন্তু পরের দোষ খুঁজে বের করতে বড়ো দক্ষ। এমন কি চৈতন্যেরও।

চৈতন্যের সারাদিনের কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া, নিদ্রার সব খোঁজখবর নিয়ে তিনি নিন্দা করতে লাগলেন। অথচ গুরুর গুরুভাই বলে তাঁকে সম্মান করতে চৈতন্য একটুও কার্পণ্য করতেন না। একদিন চৈতন্যের ঘরে কয়েকটি পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে তিনি বলে বসলেন, সন্ন্যাসিনাম্‌ ইন্দ্রিয়লালসা—সন্ন্যাসীদেরও ইন্দ্রিয় লোভ! ছিঃ!

চৈতন্য শুনে গোবিন্দকে ডেকে বললেন,—

আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥

চৈতন্য খাওয়া অর্ধেক করে দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের যেন তাতেও স্বস্তি নেই 'এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম।'

আহারের ব্যাপারে আশ্চর্য সংযত হলেন প্রভু। তেমনি শয্যার ব্যাপারেও। জগদানন্দ তাঁর শয্যার উত্তম বন্দোবস্ত করেছেন দেখে বলেছিলেন তিনি—'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, মাটিই আমার শয্যা, মুণ্ডিত মস্তকই আমার বালিশ।'

কতো ধরণের লোকের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হত তার ইয়ত্তা নাই। গোপীনাথের উপর অত্যাচার হয়, প্রভুকে এসে লোকে বলে তুমি বাঁচাও। সন্ন্যাসী মানুষ, নির্জনে সাধন ভজন করতে চান। তাও পারেন না। দুঃখে নীলাচল ছেড়ে আলালনাথে চলে যেতে চান। প্রতাপরুদ্র শুনে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

এর মধ্যে সুখ হল রথযাত্রার দিনগুলি। গৌড়বাসীদের সঙ্গে নেচে গেয়ে তাঁর পরম আনন্দ হত। একবার নিত্যানন্দ পর্যন্ত এলেন—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিল দেখিতে॥

তাঁরা এলে চৈতন্য 'জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ সঙ্গে।'

যখন নির্জনে থাকেন, তখন অন্তরঙ্গ সনে হরিকথা শোনেন।

২৮

এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্তন-বিলাস।।
দিনে নৃত্য কীর্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ মনে রস আস্বাদন।।
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে নানা হয়।।
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়।।
—চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ।

নীলাচলে মহাপ্রভু শেষ জীবনে একটানা ১৮ বছর কাটিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে শেষের বারো বছর প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায়। নিরন্তর কৃষ্ণবিরহে তিনি সদা মুহ্যমান থাকেন। নিজেকে তিনি ভাবতেন রাধা, আর ভাবতেন কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন। সর্বদা বলেন—

হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন।।

তবুও যখন গৌড় থেকে ভক্তবৃন্দ আসেন, তখন একটু আনন্দে থাকেন। নইলে 'কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন কায়।' ধীরে ধীরে প্রভুর এটিই 'উন্মাদ-বিলাপে' পরিণত হল। একদিন মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখলেন কৃষ্ণ রাসলীলায় মত্ত। কিন্তু জেগে দেখলেন কৃষ্ণ নেই। অমনি ছুটলেন জগন্নাথ মন্দিরে। গরুড়স্তম্ভে হেলান দিয়ে একমনে জগন্নাথ দেখছেন, চোখে জল। এক অত্যুৎসাহী স্ত্রীলোক ভিড়ে জগন্নাথ দর্শন করতে না পেরে চৈতন্যেরই কাঁধে পা দিয়ে দেখছেন। চৈতন্যের ভ্রূক্ষেপ নেই। এই দশাতেই তিনি রাত্রিদিন ব্যাকুল।

একদিন কাউকে না বলে চটকপর্বতে চলে গেলেন তাকে গিরি-

গোবর্ধন ভেবে। গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। বহুকষ্টে শিষ্যেরা সন্ধান করে আনলেন।

এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥

স্বরূপ-রামানন্দ তাঁকে গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী গেয়ে শোনান। চৈতন্য ও 'গান শুনে পরম আনন্দ'।

শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রে ভক্তদের নিয়ে বাগানে বাগানে হরিসংকীর্তন করে বেড়ান। এমনি করে চৈতন্য একদিন একা বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। চাঁদের আলো পড়েছে তার জলে। চৈতন্য সমুদ্রকেই ভেবে বসলেন যমুনা।

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥

ভাসতে ভাসতে ঐ দেহ কোনার্কের দিকে ভেসে গেল। শেষে ধরা পড়ল এক জেলের জালে। বড় মাছ ভেবে সে তুলে দেখে এক মৃতদেহ। মৃতদেহ ভাবলেও তখনও ভিতরে চেতনা ছিল। চৈতন্য গোঁ গোঁ করছিলেন। ভূত ভেবে দেহ সমুদ্রতীরে ফেলে জেলে চলে আসছে হরি হরি করতে করতে—এমন সময় দেখা হয়ে গেল স্বরূপ গোস্বামী-জগদানন্দ-গোবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে।

জেলের মুখে সব শুনে সমুদ্রতীরে গিয়ে তাঁরা দেখেন চৈতন্যদেহ বালুলুণ্ঠিত। কোনোক্রমে সেই বরতনু পরিষ্কার করে তাঁরা হরিসংকীর্তন করতে লাগলেন।

কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥

ধীরে ধীরে তিনি ভাল হয়ে উঠলেন এবং পূর্ববৎ দিব্যোন্মাদে মত্ত হয়ে

থাকলেন। কিন্তু মাকে কখনও ভোলেন নি। প্রায়ই জগদানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়ে মায়ের খোঁজ আনান। এর মধ্যে অদ্বৈত আচার্যের পাঠানো একটি ধাঁধাঁ চিঠি পেয়ে তাঁর 'কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল'। তাঁর উন্মাদাবস্থা বেড়ে গেল। স্বরূপ-রামানন্দ বহু চেষ্টা করে মাঝে মাঝে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বৃথা হয়।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেম সিন্ধুমগ্ন বহে কভু ডুবে ভাসে॥

এরই মধ্যে নিজের সৃষ্টি অষ্ট শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শিষ্যদের শোনান।

আমরা শেষের কথায় এসে পড়ি। কিন্তু শেষ নাহিরে, শেষ কথা কে বলবে? শেষ কথা কেউ স্পষ্ট করে বলে যাননি। বৃন্দাবন দাসও না, কৃষ্ণদাস কবিরাজও না। বৃন্দাবনের তো—

নিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ কথা রহিল অবশেষ॥

আর কৃষ্ণদাসও বৃন্দাবনদাসের পথ অনুসরণ করে শিক্ষাষ্টক শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শেষ-প্রসঙ্গ একেবারে পরিহার করেছেন।

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে॥

চৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে। কিন্তু দুজনের মত এক নয়। সে দু'টি মত আমরা একে একে উদ্ধার করছি। এর সঙ্গে আরও দুটি প্রচলিত মত আছে।

এক, চৈতন্যকে পুরীর পাণ্ডারা হত্যা করেছিল—এ সম্পর্কে নিশ্চিত বলা মুস্কিল। কারণ উড়িষ্যা রাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন চৈতন্যের একান্ত ভক্ত। তাছাড়া নীলাচলবাসী গৌরভক্তরা কি কিছু জানতেন না তাহলে? আবার পাণ্ডাদের অত্যাচারের কথাও সুবিদিত।

দুই, তিনি সমুদ্রে পুনশ্চ ঝাঁপ দিয়েছিলেন। অসম্ভব নয়। এর

আগে দুবার তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তবে একথা সত্য হলে বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস অবশ্য তা জানাতেন। যদিও চৈতন্য তিরোধানের কথা জানানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এবারে আমরা লোচন ও জয়ানন্দের মত তুলে দিই। লোচন একে-বারে দিনক্ষণ উল্লেখ করে দিয়েছেন, অন্য কোনো জীবনীতে তা নেই। তাঁর মতে চৈতন্যের তিরোধান ঘটেছিল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন বা জুলাই, আষাঢ় মাসে (১৪৫৫ শক, ৯৪০ বঙ্গাব্দ) বেলা তৃতীয় প্রহরে—

আষাঢ় মাসের তিনি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আই এই দেহত শরণ॥
এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

ঈশান নাগর তাঁর 'অদ্বৈত প্রকাশ'-এ এবং চৈতন্যের ওড়িয়া ভক্ত অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতায়' এই জগন্নাথে লীন হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। চৈতন্যদেব যখন প্রথম জগন্নাথ দর্শন করে তাঁকে আলিঙ্গন করতে যান, তখনই 'পড়িছা'রা তাঁকে প্রায় মেরে ফেলার উদ্যোগ করে। পুনশ্চ সেই ঘটনা ঘটায় মন্দিরের পুরোহিতদের ভূমিকার কথা অনেকে স্মরণ করে থাকেন। আবার ভক্তের কাছে এটা অত্যন্ত স্বাভা-বিক মনে হতে পারে। যেমন ওড়িয়া অচ্যুতানন্দ বলেছেন—

চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি বলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎ প্রায় মিশি গলে॥

বা ওড়িয়া দিবাকর দাস বলেন 'এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।'

লোচনদাসের বার এবং তিথির সঙ্গে জয়ানন্দের বার ও তিথির সাদৃশ্য আছে, যদিও পণ্ডিতদের মতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এক অপ্রামাণিক গ্রন্থ। জয়ানন্দ লিখেছেন, রথে নাচতে নাচতে ইটের টুকরো পায়ে বিঁধে (আহা, কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল ব্যাধের তীর বিঁধে) যায় এবং তা থেকে প্রবল যন্ত্রনা হয় এবং তা-ই তাঁর তিরোধানের কারণ হয়—

আষাঢ় পঞ্চমী রথবিজয় নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে।
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে
চৈতন্য করিল জল ক্রীড়া নানা রঙ্গে।
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে
সে লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।
নানা বর্ণে দিব্য মাল্য আইল কোথা হইতে
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজ পথে।
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ।
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।

বাস্তববাদী হয়তো এ বর্ণনা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু ভক্ত-অভক্ত সকলকে একথা বিশ্বাস করতেই হবে যে চৈতন্য তাঁদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একটি স্মরণীয় মানুষ

চলে গেলেন। পড়ে রইলেন শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রবীণ অদ্বৈত আচার্য এবং বহুশত ভক্ত।

চৈতন্যকে মানুষ বলেছি—মানুষই তো—'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা নর বপু তাঁহার স্বরূপ'। মানুষই তো মানুষের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, আক্ষেপ করে। দেবতার জন্য তার কোনো আক্ষেপ নেই। দেবতাকে কি মানুষ এতোখানি ভালবাসতে, এতোখানি আপনার জন ভাবতে পারে?

চৈতন্য আমাদের কাল থেকে পাঁচশো বছরের পূর্ববর্তী, কিন্তু তাঁর জীবন সাধনা এখনো আমাদের অগ্রবর্তী॥